যোগিনী
সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগিনী
সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগিনী

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি জয় গোস্বামী-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

কড়িখেলা
ঘাট
প্যান্টি ও অন্যান্য গল্প
ফাঁকি
রুহ্
শঙ্খিনী
সম্মোহন

সূচিপত্র

প্রথম সংবিৎ

যখন প্রথমবার সংবিৎ ফিরে এল তার, তখন সমুচ্ছ্রিত রাত! সে দেখল যে, সে একটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের দরজার দু'পাশের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে, দুলছে। খুব জোরে দুলছে তার শরীর। সে ঝুঁকে পড়েছে বাইরের দিকে— বিপজ্জনকভাবে। যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যাবে!

সে ভাবল— তা হলে এই কি সময়? এই ভাবেই তার সঙ্গে রচিত হবে তার নিয়তির বিচ্ছেদ? শেষাবধি এই তবে নির্দিষ্ট ছিল? লিখিত ছিল?

সে তাকাল নীচের দিকে, অমনি যেন আরও গর্জন করে উঠল রেলের ট্র্যাকগুলো। অমনি যেন আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠতে লাগল ইস্পাতের ঘর্ষণে! একটু হাত আলগা করলেই সব শেষ হয়ে যাবে!

তার আত্মা সহস্র শেকল নাড়িয়ে কেঁদে উঠল— মুক্তি! মুক্তি!

আর সে ভাবল ঝাঁপাবে!

কিন্তু তার আগেই তার হাত চেপে ধরল কেউ। সে ঘুরে তাকাল না। কারণ প্রয়োজন ছিল না! সে জানত কে চেপে ধরেছে তার হাত, সে দেখতে পেল হাতটাকে— রুদ্রাক্ষ জড়ানো। তামার কড়া, লোহার শিকলি, লাল সুতো, কালো রাবার ব্যান্ড, হাবিজাবি। রাস্তা থেকে যা পায় তুলে হাতে পরে। বড়-বড় নখে কী নোংরা! পিছনে নয়, সে চোখ তুলে তাকাল সামনের দিকে— আদি নেই, অন্ত নেই, এই চরাচর পার হয়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন! কোথাও কোনও কৃত্রিম আলো চোখে পড়ে না, অকৃপণ এক চাঁদ ভাসিয়ে দিচ্ছে ইহলোক, মাঠে-মাঠে ধরে রাখা জলে পড়েছে সেই চাঁদের আলো, আর প্রতিফলিত হয়ে লক্ষ গুণ হয়ে উঠছে জ্যোৎস্নাকিরণ। রুপোলি এক জগতের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। আর বেঢপ ফুলে উঠছে তার বুক— কিন্তু সে ভাবছে অভিমান করার মতোও তার কিছু নেই আজ!

'হোমী! হোমী! মহারানি?'— একটা হিমেল স্রোত ফিসফিস করছে তার কানে, 'কাছে এসো মহারানি!'

আর কত কাছে জটাধারী? তোমাকে দিয়েছি তো আমার সব অধিকার? কত কিছু ভাবছি কিন্তু কোনও ভাবনাকেই তো কাজে লাগাচ্ছি না? পৃথিবীর ওপর এই চিন্তার স্রোতের কোনও দৈহিক ছাপ রাখছি না! ভাবছি! ভাবনা রাখছি! কিংবা হারিয়ে ফেলছি! যাতে তোমার কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকে আমার ওপর— আমার কার্য এবং কারণের ওপর! কারণের কার্য হয়ে ওঠার ওপর! পরিণাম হয়ে ওঠার ওপর! কেননা কার্য এবং কারণ সবই তোমার মতো যান্ত্রিক, তোমার মতো স্বয়ংক্রিয়— জগৎ সম্পর্কে এই আমার শেষ অনুধাবন! এখানে সত্যিকারের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই! মৌলিক স্বাধীনতা! এই জগতে আমার একটা প্রাকৃতিক নিয়তি আছে, একটা মনুষ্যোচিত নিয়তি আছে— এ তো মেনে নিয়েছি আমি কবেই! আমি কেউ নই, নিয়তিই সব! তুমিই সব! এভাবেও তো তোমার কাছে আসা হয়?

সে এসব ভাবে— কিন্তু তার পালাতে ইচ্ছে হয়, ছাড়া পেতেও ইচ্ছে হয়! এই সময় কিছু একটা ভর করে তার ওপর, সে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং দ্বিতীয় কোনও মুহূর্ত নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগে ঘুরে গিয়ে

আঘাত করে জটাধারীর শরীরে। সে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করে নিয়তিকে তার, তারপর ধাক্কা মারে ট্রেন থেকে ফেলে দেবে বলে।

অতীত অধ্যায়— এক

হোমী কনফারেন্স রুমের দিকে যেতে যেতে শুনেছিল ওরা কথা বলছে। খুব বিমর্ষ স্বরে কিছু একটা মত বিনিময় করছে ওরা। ওরা মানে সুলগ্ন আর রজতকান্তি। দুই ইনসিডেন্ট রিপোর্টার। সে শুনেছিল সুলগ্ন বলছে, ‘এটা নিয়তি রজতদা, একে তুমি নিয়তি ছাড়া কী আখ্যা দেবে বলো?’

রজত সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে রেখেছিল, তখনও ধরায়নি। বলল, ‘নিয়তি কী আমরা জানি না! কখনও মনে হয় সবই কোইনসিডেন্স— কখনও মনে হয় ঘটনাচক্র আসলে কতগুলো টুল, ইনস্ট্রুমেন্ট! যা ঘটবে তা ঘটাবার যন্ত্র শুধু!’

এই পর্যন্ত শুনে হোমী দাঁড়িয়ে যায় ও যেতে যেতেও ফিরে আসে ওদের কাছে। সে জানতে চায় কী হয়েছে এমন যে, ওরা প্রাইম টাইমে করিডরে দাঁড়িয়ে নিয়তির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে? এবং সত্যি সত্যি সে এত অবাক হয় এই আলোচনায়, যে মনে হয় সে ‘নিয়তি’ শব্দটা আগে কখনওই শোনেনি!

সে বলে, ‘সুলগ্ন, কী নিয়ে কথা বলছিস তোরা?’

‘ওই যে লিফটম্যানটার কেসটা, তুই শুনিসনি?’ বলে ওঠে সুলগ্ন।

হোমী মাথা নাড়ে, সে শোনেনি। নিজের সাড়ে ন’টার প্যাকেজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, বিকেল থেকে কফি খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায়নি।

‘পদ্মপুকুরের কেস, পুরনো লিফট হঠাৎ আটকে গেছিল তিন আর চারতলার মাঝখানে, লিফটম্যান গেট ফাঁক করে একে-একে আটজনকে নামায়। তারপরই লিফট খসে পড়ে সোজা গ্রাউন্ড ফ্লোরে। লোকটা নিজে আর নামতে পারেনি! মাথা-ফাথা চৌচির! যা হয়!’

‘তুই কভার করতে গিয়েছিলিস?’ জানতে চায় সে।

সুলগ্ন মাথা নাড়ে। করুণ হাসে।

‘শকড?’

‘না, আমি ভাবছি কেন লোকটা নামতে পারল না? সবাই নামল। প্রায় সত্তর মিনিটের চেষ্টায় সবাই নেমে গেল শুধু একজন পারল না? এতক্ষণ এত নড়াচড়া, টানাটানি সত্ত্বেও লিফট ছিঁড়ে পড়ল না, তারপর শুধু শেষ মানুষটা যখন নামতে যাচ্ছে. . .!’

রজতকান্তি বলল, ‘নিয়তি! তুই ঠিক বলছিস, নিয়তি! মৃত্যু লেখা ছিল ওর এইভাবে!’

শুনতে-শুনতে হোমীর শরীরটা কেমন খারাপ করে উঠল যেন। শিরশির করে উঠল গা। সে বলল, ‘কী বলছিস তোরা? নিয়তি? সেটা কী সুলগ্ন? আমাদের জীবনে এসব শব্দের কোনও ভূমিকা আছে বলে মনে হয় তোদের?’

সুলগ্ন তাকাল তার দিকে, ‘আছে! নিশ্চিতভাবেই আছে! আমি জানি, আলটিমেটলি ডেসটিনিই আমাদের চালায়— তুই যাই করিস, তুই আসলে জালের মধ্যে আটকে পড়া মাছ!’

রজতকান্তির ফোন বাজছিল। বলল, 'তুই অত মুখ শুকোচ্ছিস কেন? তোর নিয়তি একটু পরেই তোকে পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যাবে— নিশ্চিন্ত থাক!'

সুলগ্ন তাড়াতাড়ি বলল, 'তোরা পার্টি করছিস নাকি আজকে?'

রজত সরে গেছে। সে সুলগ্নকে বলল, 'না। করলে তোকে বলতাম।'

তারপর সে আবার এগোল কনফারেন্স রুমের দিকে, যেখানে যশ বৈদ্য অপেক্ষা করছে তাদের সবাইকে নিয়ে দিন শেষের মিটিংটা সেরে নেবে বলে।

অতীত: দুই

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। নিয়তি সংক্রান্ত ছোট্ট প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে হোমী, কারণ সেটাই স্বাভাবিক। এই চব্বিশ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেলে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তা সংবাদ হয়ে আছড়ে পড়ে যেমন, তেমনই বুড়বুড়ি কেটে মিলিয়ে যেতেও দেরি হয় না, কারণ ততক্ষণে অন্য কোথাও ঘটে গেছে অন্য কোনও ঘটনা। নির্দিষ্ট ঘটনাকে ঘিরে অনেক সময়ই অনেক প্রশ্ন ধেয়ে আসে মনে, অনেক চিত্তচাঞ্চল্য তৈরি হয় কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় পরবর্তী খবরের দিকে। হাতে সময় থাকে না— ঘটনা ঘটে, খবর তৈরি হয়, খবর পরিবেশিত হয়, বিশ্লেষিত হয়, বিতর্কিত হয়— কিন্তু সেখানেই থেমে থাকলে চলে না।

তিন বছর আগে তাদের মিডিয়া হাউসের সি.ই.ও. যখন ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন হোমীর, তখন জানতে চেয়েছিলেন, 'বলতে পারো সাহিত্য আর সংবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

হয়তো সে সাহিত্যের ছাত্রী বলেই এ প্রশ্ন করা হয়েছিল তাকে। এবং উত্তরটা ভাবতে হয়নি, সে বলেছিল, 'সংবাদ যদি বৃষ্টিপাত হয় তা হলে সাহিত্য মাটির তলার জল। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ে বছরের পর বছর সময় নিয়ে অল্প-অল্প করে মৃত্তিকার অনেকগুলো স্তর পার হয় এবং একসময় বিশুদ্ধ জল হয়ে ওঠে! সংবাদ এই মুহূর্তের ঘটনা— সাহিত্য হয়ে উঠতে তাকে সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সংবাদের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় সময়, দর্শন, তখনই তা সাহিত্য!'

ঋষি পটেল, তাদের সি.ই.ও, আধ মিনিট তাকিয়ে থেকেছিলেন তার দিকে, বলেছিলেন, 'সময় পেলে আমরা পরে এই নিয়ে আরও কথা বলব!' মনে আছে হোমীর।

ঠিক কতদিন পরে মনে নেই। রাত দশটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়েছে হোমী সেদিন, তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে হঠাৎ দেখল রাস্তার ওপারে ঠিক 'জিমিজ্ কিচেন'-এর আলোকিত অংশটার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক জটিল চেহারার সাধু! দূর থেকেও তার স্পষ্ট মনে হয়েছিল লোকটার চোখ দুটোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং লোকটা তাকেই দেখছে। বিষয়টা ভাল করে রেজিস্টার করার আগেই চোখ সরাতে হয়েছিল হোমীকে, কারণ রাস্তা পার হচ্ছিল সে। তার পরই আবার সে তাকিয়েছিল লোকটার দিকে। কিন্তু লোকটা তখন কোথাও ছিল না। রাস্তা পার হয়ে 'জিমিজ্ কিচেন'-এর সামনে পৌঁছে একটা কৌতূহল নিয়ে হোমী খুঁজেছিল সাধুকে। তার মনে হয়েছিল চোখের ভুল হতে পারে।

ভুল? কিন্তু ওই মারাত্মক তীব্র চাউনি এক নিমেষেই মনে গেঁথে গেছিল তার। কেমন একটা ভয় ভয় করে উঠেছিল। ঠিক তখনই শরীরের বাঁদিক থেকে, খুব কাছ থেকে কেউ ফিসফিস করে ডেকেছিল, 'মহারানি?'

দারুণ চমকে তাকিয়েছিল সে আর দেখেছিল সেই সাধুকে। তার মনে হয়েছিল যেন সে ফ্রিজের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাধুর শরীর থেকে ঠান্ডা হাওয়া বেরোচ্ছিল একটা। ভীষণ ঠান্ডা। সে জমে গেছিল ভয়ে।

ভয়াবহ মুখ একটা— জটা, দাড়িগোঁফ যেন মাকড়সার মতো ছেয়ে আছে মুখে মাথায়, ধক্‌ধক্ করছিল চোখ দুটো, একটা কটু গন্ধ বেরোচ্ছিল গা থেকে। গাঁজার গন্ধ, মনে হয়েছিল তার।

ছিটকে দু'পা সরে গেছিল হোমী, 'কে? কী চাই?'

বোধহয় এটাই বলতে চেষ্টা করেছিল। হতে পারে কল্পনার অতীত ভয়ে কণ্ঠস্বরই ফোটেনি তার।

'মহারানি, আমায় চিনতে পারছ না?' লোকটার কাঁধ থেকে খসে পড়েছিল কম্বল। লোকটা সেটাকে আবার কাঁধে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সে পিছোচ্ছিল, সাধু এগোচ্ছিল, চিমটে ধরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে। সে এটা বুঝতে পারছিল আর দ্বিতীয় কেউ লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না— কারণ এরকম ভয়ংকর চেহারার একটা লোক এত রাতে এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে একটা একা মেয়ের দিকে আর কেউ তা গ্রাহ্য করছে না— এ হতে পারে না!

সে বুঝেছিল উলটো দিকে অফিসে অসংখ্য পরিচিত লোকজন রয়েছে কিন্তু সে কারও সাহায্যই নিতে পারবে না। লোকটাকে একাই ফেস করতে হবে তাকে।

এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে, 'ক্যয়া চাহিয়ে?'

চিমটেতে শব্দ করেছিল সাধু। কট, কট, কট, কট! টানটান হয়ে উঠছিল দীর্ঘ শরীরটা, জ্বলন্ত চোখ দুটোর মধ্যে জেগে উঠতে দেখেছিল হোমী নির্নিমেষ মোহ, মায়া। 'পাস আও!' কী নিষ্ঠুর করুণ কণ্ঠস্বর। বর্বর উচ্চারণ!

লোকটা আবার ইশারা করেছিল, 'আও! আ যাও!'

'হাউ ফানি!' বলে উঠেছিল সে। কী জঘন্য ইশারা!

একটু নীরব থেকে, 'মহারানি, আমাকে চিনতে পারলে না। আমি তোমার নিয়তি!' বলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েছিল লোকটা।

চুম্বন ও দীর্ঘকায়া

তার এই জীবনের ওপর প্রথম এসে পড়ল নিয়তির থাবা। সে সতর্ক হতে পারল না। সুযোগই পেল না! জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই 'নিয়তি' শব্দটাকে প্রতিস্থাপিত করতে সাহায্য করেনি সেদিন হোমীকে। এ জে সি বোস রোড ধরে ছুটে আসছিল একটা বিশাল ট্যাঙ্কার। ফুটপাথে উঠে যেতে-যেতে সে রাতে হোমী ভেবেছিল, নিয়তি কী? নিয়তি কাকে বলে? সে জানে না। ঘটনাকে সে বরাবর অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। সেই অভিজ্ঞতা যা নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে— আমি কে? আমি কী? আমি কেন?— এইসব প্রশ্নের উত্তর জোগাড় করে ক্রমান্বয়ে আর তৈরি করে এক নিঃসঙ্গ মানুষকে, যে 'আমি' বলে চিহ্নিত হতে পারে শুধু।

কিন্তু জটাধারী হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেও 'নিয়তি' শব্দটা ছেদহীন, যতিহীন এক বিষাদ বিদ্রূপ হয়ে থেকে গেল হোমীর সঙ্গের বাতাসে ভর করে। আর তাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল যেন। যে আবহ ফুঁড়ে উঠল হঠাৎ, হোমী দেখল তা তার পায়ের তলার মাটি আলগা করে দিয়ে গেছে। কিংবা যেন নগ্ন করে দিয়ে গেছে তাকে!

'ও আমার নিয়তি?' ভাবল সে। তার বমি পেল। আর শরীরের মাংস পর্যন্ত অপমানে, অভিমানে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে চাইল। যেন সে জেনেছিল এতদিন, তার 'নিয়তি' থাকতে পারে না— কক্ষনও না! অসম্ভব!

রাস্তার ওপারে এই সময় ডিউটি বদল হচ্ছিল অফিসের গার্ডদের। যারা ছিল এবং যারা এল নতুন করে খইনি ডলতে ডলতে তারা বাক্যালাপ সেরে নিচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকারের বিরাট গ্রে-হাউন্ডটা রোজকার মতো এই সময় সমস্ত কম্পাউন্ড জুড়ে ঘোরাঘুরি করছিল। ভাত আর মাংসের ছাঁট খাওয়া মুখ মুছছিল। সে পরিষ্কার শুনল অন্য দিনের মতোই নিউজ রিডার প্রিয়দর্শিনী 'টাইগার, টাইগার' বলে ডেকে আদর করছে কুকুরটাকে।

বস্তুত অফিসেও এই সময় শিফট শেষ হয়ে নতুন শিফট শুরু হচ্ছে, হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা, এবং ঢুকছেও। পিকআপ কারগুলো আসছে আর ড্রপ কারগুলো তোড়জোড় করছে বেরোনোর। গাড়ি এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে কম্পাউন্ডময়। ভীষণ হল্লা হচ্ছে। মেয়েরাই চেঁচাচ্ছে বেশি, কারণ তারা নিরাপদে বাড়ি ফেরাটাই নিশ্চিত করতে চায়। কেউ তারা শেষ যাত্রী হিসেবে নামতে চায় না। তা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। বিশেষত যদি সেই মেয়েরা হয় বিবাহিতা।

করণ, অভিষেক, রাহুল, আদিত্যদের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। আঠাশ-ত্রিশের ছেলের দল সারাদিন বিপুল প্রেশারে কাজ করার পর রাতে বাড়ি ফিরতে চায় না চট করে। তাদের ডেস্টিনেশন তখন পার্ক স্ট্রিট পাড়ার কোন পাব, কিংবা চায়না টাউন। শুক্রবার-শনিবার রাত হলে নাইট ক্লাব অথবা বন্ধুর ফাঁকা ফ্ল্যাট— যেখানে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যাওয়া যায় এবং পরের দিন বেলা দশটা অবধি সজনেডাঁটার ছিবড়ের মতো পড়ে থাকা যায় বিনা বাধায়। প্রতিদিনই গাড়ির চার্জে থাকা মৈনুদ্দিনের সঙ্গে বচসা বাধে ছেলেমেয়েদের। সবাইকে সব সুবিধে দিতে দিতে পাগল হয়ে ওঠে বেচারা মৈনুদ্দিন।

অন্য দিন সেও রুট ছয়ের গাড়িগুলোর একটায় উঠে বসে দশটার পরে। বিশেষত এই মরসুমে তার টানা বারোটা-দশটা শিফট চলছে। মর্নিং পড়েনি। আর নাইট কখনওই করেনি হোমী। দরকার হয়নি।

মর্নিং পড়লে ভোর পাঁচটায় উঠে জিন্স গলাতে হয় তাকে। কিন্তু গত কয়েকটা মাস প্রতিদিনই ভোরবেলা চোখ মেলার আগেই সে টের পায়, তাদের বিছানাটা একটা জাহাজ হয়ে দুলে দুলে চলেছে কোনও গভীর নাব্যতার দিকে আর এক জলদস্যু সে কিছু ভাল করে বোঝার আগেই লুঠ করছে তাকে। সে সেই জলদস্যুর চোখে কতদিন আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছে, 'ঘুমোতে ঘুমোতে তোর এত কাম জাগে কী করে?'

উত্তরে জলদস্যু নিজের ওপর তুলে নিয়েছে তাকে, বলেছে, 'স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো জাগে। বিশ্বচেতনা বা বিদ্রোহ তো নয়!'

এই সময়গুলো কী ভাল জীবনের পক্ষে— কী পরিপূর্ণ যেন। খোলা আস্তাবল থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া দুই অশ্বারোহী যেন তারা। একই ঘোড়ায় আসীন। হাতে হাতে ধরা একই লাগাম। ছুটছে, ছুটছে, পোশাক খসে পড়েছে কোন অগোচরে। এক জায়গায় একটা খাদানের ধারে পৌঁছে অতঃপর ছোটা বন্ধ, শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে দু'জনে তখন। চেপে ধরে আছে পরস্পরকে— কী ভয়! কী অত্যধিক ভয়! পড়ে যাওয়ার ভয়। কিংবা আসলে ভয় তাকেই যাকে সে ভালবাসে, সম্পূর্ণ ভালবাসে মনে হয়! অথচ এই সময় ললিতকে তার মুহুর্মুহু অচেনা লাগে। যখন বীর্যপাত ঘটে ললিতের তখন হোমী ভাবে বীর্যপাতের সময় ললিত কার— তার? নাকি নিজের? এইসব সূক্ষ্ম প্রশ্নের উত্তর এ জীবনে পাওয়া দুষ্কর বলে জানে সে।

রুট ছয়ের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে আধ ঘণ্টা লাগে হোমীর। মোটামুটিভাবে গাড়িটা মতিলাল নেহরু রোডে নামায় পৃথাকে, যতীন দাস রোডে নামায় তমসকে, ভেতরের রাস্তা ধরে তারপর হিন্দুস্থান পার্কে তাকে নামায়, তারপর একে একে সুমিত, বাসুদেবন, অর্জুন এদের। এসব নামগুলোর প্রায়ই অদলবদল ঘটে। তাতে কিছু অবশ্য আসে যায় না। এই সময় সকলেরই মন পড়ে থাকে বাড়ির দিকে। কো-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নিয়ে অভিনিবেশ থাকে না কারওই। পৃথার মতো জীবন যার, সে প্রতি মুহূর্তে ঘড়ি দেখে। কারণ আটটা বাজলেই ওর আয়া চলে যায়। সাড়ে দশটাতেও যদি ফিরতে পারে পৃথা তা হলেও আড়াই ঘণ্টা ওর এক বছরের মেয়ে বিরক্ত শাশুড়ির তত্ত্বাবধানে কাটায়। বাচ্চা বেশি উৎপাত করে যেদিন, কাঁদে, ঘ্যানঘ্যান করে সেদিন বাড়ি ফিরতে না- ফিরতে পৃথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বর।

পৃথা প্রতিদিন অফিসে আসে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। তারপর কনফারেন্স রুমে যেই যশ ডেকে পাঠায় ওকে, বলে, 'পৃথা মার্কেট পড়ছে, সকাল থেকে বারোশো পয়েন্ট পড়েছে। অ্যানালিস্ট- ফিস্ট নিয়ে এক্ষুনি লাইভে বসে যাও তুমি, কুইক!'— অমনি সব ভুলে যায় পৃথা। সংসার, স্বামী, বাচ্চা, শাশুড়ি সব ভুলে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। সহকর্মীদের তাগাদা দেয়, 'ধর, ধর, প্রফেসর মাথুরকে ধর শিগগিরি! ওঁকে আজ পেতেই হবে আমাদের!'

'জিমিজ্ কিচেনের' সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়েছিল কী কারণে রুট ছয়ের কোয়ালিস বা ইন্ডিকায় না-উঠে পড়ে সে আজ রাস্তা পার হতে চেয়েছিল। মনে পড়েছিল আজ ওভাবে বাড়ি ফিরবে না সে। বাড়ি ফিরবে বারোটা বাজার একটু আগে ললিতের হাত ধরে। তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিছানায়

যাবে। অধৈর্য হাতে মোমবাতি জ্বালাবে একটা, যেটা সারারাত জ্বলতে সক্ষম। ওয়াইনে চুমুক দেবে। ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটার ঘরে পৌঁছোবে ঠিক তক্ষুনি সম্পূর্ণ আবেদ্যমান হয়ে ললিত ঠোঁট স্পর্শ করবে তার। আর সে সাড়া দেবে টিট্টিভের মতো। কণ্ঠনালির ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করবে প্রেম। সেই 'প্রেম' যা প্রত্যাশার অতীত প্রকাণ্ড ও আশ্চর্য! সেই 'প্রেম' সমুদ্রতটের সমস্ত বালিকণা নেড়ে ঘেঁটে একটি দানাকে খুঁজে পাওয়ার মতো দুরূহ ঘটনা জীবনে। এই প্রেমের জন্য কত অন্ধিসন্ধি হাতড়াতে হয়েছে তাকে। কত ইন্দ্রিয়যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে। সে বুঝেছে, প্রেম এক বাস্তব মিথ। কখনও ললিতকে, কখনও অন্য কাউকে ভালবাসতে বাসতে এইসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে হোমী।

ললিত বলেছে চিনেবাদামের খোসা মুঠোয় ডলে ফুঁ দেওয়ার মতো একটা চুমু খাবে ও হোমীকে। চতুর্দিকে, কাঁধে, কোলে চুম্বনের গুঁড়ো ঝরে পড়বে একসঙ্গে। বুঁদ এক প্রজাপতির মতো সুরুয়া করে টেনে নেবে ললিত হোমীর ওষ্ঠের মধু। কিন্তু তারও আগে 'জিমিজ্ কিচেনের' সামনে থেকে হোমীকে পিকআপ করে পার্ক স্ট্রিট নিয়ে যাবে ললিত। সংক্ষিপ্ত নৈশভোজ সারবে তারা দু'জনে কোথাও। কারণ বারোটার আগে যে করে হোক বাড়ি ফিরতে হবে চমৎকার রাত্রিটার জন্য। বারোটা বাজলেই ললিতের সঙ্গে হোমীর বিবাহের একটা বছর পূর্ণ হবে। এক বছর আগে ছ'মাসের রোমাঞ্চকর এক প্রেমপর্ব পরিণতি পেয়েছিল এই বিবাহের মাধ্যমে।

অবশ্য আদৌ 'পরিণতি' বলে যদি কিছু থেকে থাকে জীবনে!

এবং রুদ্রকে ছেড়ে ললিত অবধি পৌঁছোতে তার ছ'মাসই লেগেছিল। আর অর্ক থেকে রোহিত হয়ে রুদ্র, কিংবা মাঝখানে বীতশোক বা অন্য কেউ এসে পড়ে থাকবে— তারই বা কতটা সময়? পাঁচ-সাত বছর হবে। এই সময়ের মধ্যে তার ধারণা হয়েছিল 'প্রেম' খুঁজে পাওয়া কঠিন।

হোমী নিজের শ্রেষ্ঠ প্রেমটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, একটু আগে যা ঘটে গেল এখানে, এই রাত সোয়া দশটার এ জে সি বোস রোডের ওপর, তারপর বেরিয়ে আসার সময় মেকআপ রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্ন সহকারে ক্র্যানবেরি লিপস্টিক লাগানো ঠোঁট তার নির্বোধের মতো ছেতরে আছে এখনও। এখনও বুক কাঁপছে তার!

'ডুব যা মেরে প্যায়ার মে/ ডুব যা মেরে প্যায়ার মে!' মোবাইলে বেজে উঠলে হোমী বুঝল, ললিত কাছাকাছি এসে গেছে। হিম ভাব ঝেড়ে ফেলে সে ফোন ধরল, 'দাঁড়িয়ে আছি!' তার গলার শীতলতা চমকে দিল তাকেই। সে ভেবে পেল না আজকে, এই মুহূর্তে ললিতকে জটাধারীর কথা বলা ঠিক হবে কিনা! এবং তার এও মনে হল, এ তার বিভ্রম কোনও। হয়তো আসলে এমন কিছু ঘটেনি কিন্তু মুখ দিয়ে বলামাত্রই সেটা সত্যি হয়ে যাবে! সে ললিতকে কিছু বলবে না ঠিক করল। কিন্তু স্বপ্নোত্থিত এক অশরীরী দ্বৈধ সে টের পেল শরীরে বিচ্ছিরিভাবে লেপটে আছে ঠিকই!

থিয়েটার রোড থেকে বাঁদিক ঘুরে দেখা দিল তাদের কালো গাড়িটা। সামনে এসে দাঁড়াতে হোমী উঠে বসল গাড়িতে।

'মুখটা এরকম হয়ে আছে কেন?' হোমী গাড়িতে উঠতেই প্রশ্ন করল ললিত। সে দেখল ললিতের মুড খুব ভাল রয়েছে এখন। অফিসের প্রাণান্ত পরিশ্রমের কোনও চিহ্ন নেই চোখেমুখে। নিভাঁজ শার্টের কলার। ফুরফুর

করছে চুল। সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। ললিত প্রশ্নটা করল কিন্তু খুব একটা উদ্বিগ্ন হল না আসলে। হয়তো ভেবে নিল অফিসে হোমী ঝাড়টাড় খেয়ে থাকবে, যা প্রায়ই অল্পবিস্তর খেয়ে থাকে সে। আলস্যের জন্য, কুঁড়েমির জন্য। সে যে বিশ্বকুঁড়ে তা কে না জানে! গত সপ্তাহেই পারফরম্যান্স কাউন্সিলিং-এর সময় এইচ আরের অনুপ সিন্‌হাকে সে উদাস মুখে জানিয়ে দেয়, 'আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হলে আপনাকে এই রকমই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অনুপদা। আমি কুঁড়ে কিন্তু ফাঁকিবাজ তো নই!' তার উত্তর শুনে কনফারেন্স রুমের শেষ প্রান্তে বসে আই-ফোন ঘাঁটতে থাকা যশ বৈদ্য খুকখুক করে হেসেছিল না?

ললিতের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে দিতে পারত সব। ইচ্ছাত্মক জীবনে অভ্যস্ত হোমী নিজেকে কখনও দমন করেনি। ইচ্ছেকেই সব বলে জেনে এসেছে সে। তবু আজ সে রাস্তা বদলে নিল, বলল, 'রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্যাঙ্কারের নীচে চাপা পড়ছিলাম আমি ললিত!'

বাঁদিকে ঘুরে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকবে বলে ইনডিকেটর অন করেছিল ললিত, ওই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে, সবেগে থাবার মধ্যে চেপে ধরল হোমীর মাথা, 'কী বলছিস?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে।

'কী যে করিস না! সেদিন বাস, আজ ট্যাঙ্কার! এত কীসের অন্যমনস্কতা?' ললিত গাল স্পর্শ করল তার, 'ভয় পেয়েছিস?'

সে ললিতের হাত টেনে রাখল বাম স্তনের ওপর, 'দ্যাখ!'

ললিতের হাতের স্পর্শ পেয়ে অধিকতর ঠেলে ঠেলে উঠল যেন তার হৃদয়। আপশোসসূচক শব্দ করে তার কপালে চুমু খেল ললিত, 'তোর এই প্রবলেমটার সঙ্গে কী করে ডিল করি বল তো খুকু? এরকম ফাঁকা রাস্তায় যদি চাপা পড়তে যাস তা হলে দুশ্চিন্তার ব্যাপার— কী ভাবছিলি?'

'আমি এভাবে বাঁচতে চাই না ললিত!' বলে উঠল হোমী।

'মানে?' ললিত আঁতকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'মানে আমি অ্যাক্সিডেন্টে মরতে চাই না।'

'বেশ, বেশ! তাও ভাল!'

'কিন্তু আমার নিয়তিতে যদি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু লেখা থাকে, তা হলে?' সে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

ললিত অবাক হল খুব, 'নিয়তি, অ্যাক্সিডেন্ট, মৃত্যু— বাপ রে! চাপা পড়ছিলি। পড়িস তো নি!'

'সেটাই কি সব?' বলেছিল হোমী।

পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়েছিল ললিত। বারোটার আগে বাড়ি পৌঁছোতেই হবে। ডিনার অর্ডার করে, খেয়ে, আবার ড্রাইভ করে হিন্দুস্থান পার্ক পৌঁছে ঠিক বারোটার সময় পরস্পরকে চুম্বন করা যাবে কিনা— এর মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা আছে। একটা অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া আছে সময়ের উদ্দেশে। এই যেমন ট্রেন কিংবা প্লেন ধরার সময় ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকে হোমী। যে সময়ে বেরোলে টায়ে-টায়ে পৌঁছে যাবে তার একটু পরে বেরোয় রাস্তায় আর পুরো যাত্রাপথ তাকে যা আচ্ছন্ন করে রাখে, আক্রান্ত করে রাখে, তার নাম উৎকণ্ঠা! এবং তাই তার পক্ষে নিদারুণ উপভোগ্য! একবার এই খেলায় সে সত্যিই ট্রেন মিস করেছিল।

গাড়ি পার্ক করতে-করতে ললিত আর একবার জেনে নিল সে কেমন বোধ করছে।

রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময়ই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আষাঢ় মাস, নামতেই পারে। দোতলায় যেখানে বসল হোমী আর ললিত মুখোমুখি, তার গা ঘেঁষে কাচের দেওয়াল, দেওয়ালের ওপাশে চলমান পার্ক স্ট্রিট। তারা বসেছে কি বসেনি, এমন তুমুল নামল বৃষ্টি যে, ওপাশের দৃশ্য বিলকুল ঝাপসা হয়ে গেল। কাচ বেয়ে নেমে আসতে লাগল মোটা মোটা জলের স্রোত। আর সেই আকুলিবিকুলি জলধারার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া, গাড়ির লাল, হলুদ আলো ধেবড়ে যাওয়া রঙের মতো দেখাল কাচের ক্যানভাসে। হোমী অপলক দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। ধীরে ধীরে সেই জল আর আলো ভেদ করে ফুটে উঠল এক জোড়া ঈর্ষাকাতর চোখ! এই চক্ষুদ্বয় আধ ঘন্টা আগে খুব কাছ থেকে দেখেছে হোমী। বোবায় ধরা মানুষের মতো হয়ে গেল সে।

একসময় সে দেখল টয়লেটে যাওয়া ললিত ফিরে এসে ডাকছে তাকে, 'কী ব্যাপার বল তো!'

তারপর বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল ললিত, 'কিন্তু সবটাই কি মুড খুকু? আজ একটা স্পেশাল ডে!'

সে বলে উঠল, 'না, না, শোন...!'

ললিত বলল, 'ছাড়! যাই হোক, আজ তোকে দারুণ লাগছে!' ললিত মোবাইলের ক্যামেরায় তার ছবি তুলল কয়েকটা। সেই ছবিতে হোমীকে, প্রথম বিবাহবার্ষিকীর প্রাক্ মুহূর্তের হোমীকে, দেখাল একাকী, নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, অন্যমনস্ক! যদিও অফিস থেকে বেরোনোর সময় মুখে জল স্প্রে করেছিল হোমী মেকআপ রুমে ঢুকে। তারপর অল্প প্রসাধন করেছিল। চেঞ্জিং রুমে ঢুকে শার্ট বদলে কালো জর্জেটের টপ চড়িয়েছিল অঙ্গে। কোমরে আটকে নিয়েছিল সোনালি বেল্ট। বদলে নিয়েছিল জুতোজোড়া। অকাতরে পারফিউম ঢেলেছিল শরীরে। এসব সে করেছিল সম্পূর্ণ ফোকাসড্ হয়ে। ললিতের জন্য!

তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল মেকআপ রুম। মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার ড্রেসার সব চলে গেছে। আটটা-দশটার কমপেয়ারিং সেরে প্রিয়দর্শিনী চোখ বুজে বসে ছিল একা। সে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে বলেছিল, 'বরের সঙ্গে যাচ্ছিস?'

সে হেসে মাথা নেড়েছিল।

প্রিয়দর্শিনী বলেছিল, 'লুকিং সেক্সি!'

ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল যারা, তাদের চোখের ভাষাও একই কথা বলেছিল হোমীকে। শমীক বলেছিল, 'বস, ফাটিয়ে দিয়েছ! অফিসেও তো মাঝে মাঝে এরকম মাঞ্জা দিয়ে এলে পারো!' অথচ আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিধ্বস্ত লাগছে তার নিজেকে!

ললিত সিগারেট ঠোঁটে ধরতেই ওয়েটার পকেট থেকে লাইটার বার করে অগ্নিসংযোগে সাহায্য করল। ললিত বলল, 'তুই সিগারেট খাবি?'

'না!' বলল সে। 'অর্ডারটা প্লেস করে দে। একটা প্রন বলিস!'

হোমীর মনে হল এই দৃশ্যটা আগেও দেখেছে সে। এরকমই সব কিছু। এই কাচের দেওয়াল ঘেঁষা টেবিল, এরকমই বৃষ্টি যা সব ধুয়ে-মুছে দেয়। এমনকী মেনু-বুক হাতে ধরে মনে হল হুবহু একই খাবার অর্ডার দিতে যাচ্ছে সে আর ললিত মিলে। যেন জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই একধরনের পুনরাবৃত্তি মাত্র! জন্ম বা মৃত্যু বাদে সেরকম কোনও মৌলিক ঘটনাই ঘটে না জীবনে। যেন...!

সে নিজেকে বলল, আসলে সেই চোখ দুটো কাচের ওপাশে ছিল না। সে ভুল দেখেছে! কিন্তু অশান্তি তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার। সে বলে উঠল, 'ললিত, আমার না, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না জানিস? শরীরটা খারাপ লাগছে।'

মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল ললিতের মুখটা, 'খাবি না?'

'কেমন-কেমন লাগছে।'

'কেমন লাগছে?'

'মনে হচ্ছে কেউ আমাকে দেখছে। অনুসরণ করছে!'

ললিত এদিক-ওদিক তাকাল, ভুরুর ইশারায় বলল 'কে?'

কেমন সতর্ক হয়ে উঠল ও। হোমীর ভাল লাগল, নিরাপদ লাগল তাই দেখে। সে বলল, 'কে আমি জানি না! তবে কেউ একটা!'

'লোকটা কি এখানে ঢুকেছে?' জানতে চাইল ললিত।

'না!'

ললিত এলিয়ে পড়ল সোফায়, 'তুই রোজ রাতে হরর মুভিগুলো দেখা বন্ধ কর!'

সে বিষণ্ণ বোধ করল এই কথায়, 'আজ যা হয়েছে তুই বিশ্বাস করতে পারবি না ললিত!'

'কিছু যে হয়েছে বুঝতেই পারছি! কী হয়েছে?'

'একটা সাধু... যখন তোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম... সাধুটার কেমন একটা সেক্স-স্টার্ভড্ চেহারা! বলল, আমার কাছে এসো! আমাকে ডাকছিল। ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ, জানিস। আমার ইচ্ছে করল চলে যাই ওর সঙ্গে।'

ললিতের মুখটা কেমন হয়ে গেল। সংযত মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'খুকু, তোর প্ল্যানটা কী? ইউ ওয়ান্ট টু স্পয়েল দ্য নাইট? অনেক তো হল— আর কেন নখ্‌রা করছিস? বিয়ের দিনও তুই আমাকে এরকমই ভুগিয়েছিলিস! সেসব ঠিক আছে— কিন্তু মজাটা আর মজা থাকছে না। আমরা জীবনটা শেয়ার করতে চেয়েছিলাম কি না খুকু, তুই বল? কিন্তু তুই তো নিজের জগৎ থেকে বেরোতেই পারছিস না। আমি এতভাবে হেল্প করছি তোকে। কিন্তু তুই, তোরা শুধু আত্মতোষণ ছাড়া কিছু বুঝিস না।'

'তোরা' বলতে কখনও ভুল হয় না ললিতের।

অসহায়ের মতো হাত দুটো কোলে নামিয়ে রেখেছিল হোমী, 'ললিত, আমি নিজেকে উজাড় করে তোকে ভালবেসেছি। বিশ্বাস কর!' এটুকুই বলতে চেষ্টা করল সে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

'সেটা তুই ভাবছিস!'

'ললিত, আমার ভয় করছে। সাধুটা এখানেও এসেছে, আমি জানি!'

হঠাৎ মমত্বের ছায়া ঘনাল ললিতের চোখে। আগেও ঘনিয়েছে এরকম কতবার, ও বলল, 'তোরা শুধু সবকিছু একতরফা পেতে চাস খুকু। কাউকে কিছু দিতে পারিস না! তোর ধারণা নেই আজ কী ক্লান্ত আমি। বসে থাকতে পারছি না। শুধু তোর জন্য...,' ললিত থমকাল, 'ভয় কী খুকু? আমি তো আছি। আছিই!'

সে বলল, 'যদি কখনও না থাকিস?'

ললিত ঠান্ডা চোখে তাকাল তার দিকে, 'আজই এসব কথা বলার দিন খুকু?'

'বল না!' তার জেদ চেপে গেল। সব সময়ই তাই যায়।

ললিত হাত বাড়াল তার দিকে, 'আয় কিছু খেয়ে নিই। তারপর ফিরতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে!'

সে তাকাল বাইরের দিকে, 'তোর কি মনে হয়— আমরা বারোটার আগে ফিরতে পারব, না পারব না?'

'পারব না কেন? সাড়ে এগারোটায় বেরোলেই হবে এখান থেকে?'

'হয়তো পারব না আমরা ললিত! হয়তো আজ রাত বারোটার জন্য তুলে রাখা চুম্বনটা তোর নষ্ট হয়ে যাবে!'

ললিত বলল, 'হবে না, বারোটায় যেখানে থাকব সেখানেই চুমু খাব তোকে। আয়, আমার পাশে এসে বোস! খাইয়ে দেব?'

সে ডুকরে উঠে বলল, 'ললিত, আমি তোর জন্য কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমি তোকে ভীষণ ভালবাসি!'

'জানি!' বলল ললিত।

এইখানে ললিত এবং হোমীর কথা আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার।

হোমী আর ললিত। একজন ছাব্বিশ, অন্য জন আঠাশ! নববিবাহিত দম্পতি। হোমী পি জি, যাদবপুর, বিষয় ইংরেজি। ললিত বেঙ্গালুরু থেকে এমবিএ করেছে। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হোমী কীভাবে শেষে ঢুকে পড়েছে মিডিয়াতে। ললিত প্রথম থেকেই অবশ্য ব্যাঙ্কিং-এ। দু'জনেই আপাতদৃষ্টিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ সফলতার দৌড়টাকে ঝেড়ে ফেলতেও ভালবাসে সময়ে সময়ে, বা বলা যায় ঝেড়ে ফেলতে পারার যৌবনোচিত নির্ভীকতা এখনও ওদের কাটেনি পুরোপুরি। হোমী এখনও অধ্যাপনায় যাবে কি না ভাবে! মিডিয়ার গ্ল্যামার আর ঘটনাবাহুল্য থেকে সরে যাবে ভাবে। ললিত চাইলেই বিদেশে যেতে পারে, এমনকী মুম্বাই বা ব্যাঙ্গালোরে গেলে দ্বিগুণ হয় ওর স্যালারি। কিন্তু কলকাতায় থাকতেই বেশি ভাল লাগে ওর। দু'জনেই আবেগপ্রবণ। অনেক সময়ই জীবনকে আবেগের মানদণ্ডে মাপে। তবে আজকাল হোমীর ধোঁয়াটে ভাবে মনে হচ্ছে তাদের জীবনে ভাবাবেগ বা বস্তুবাদ দুটোর কোনওটাই খুব একটা জোরালো নয়। আজ বাদে কাল একটা অন্যটার জায়গা নিয়ে নিতে পারে বা নেয়। তবে একই জাতীয় যুবক-যুবতী হওয়া সত্ত্বেও হোমীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে ললিতের আত্মত্যাগ অনেক বেশি বা একা ওরই যাবতীয় কনট্রিবিউশন। বাইরের দিক থেকে দেখলে হোমী একটা সম্পূর্ণ আত্মমুখী মেয়ে! হাসিখুশি হয়তো, কিন্তু যারা চেনে ওকে তারা জানে যে, ওর মধ্যে একটা নেগেটিভ চিন্তার সক্রিয় ক্ষেত্র আছে। এই কারণে অনেকেই অপছন্দ করে হোমীকে, ভয় পায়, এড়িয়ে চলে।

হোমী যে ওকে ভালবাসে এ কথা ও জানে বলার সময় আঠাশ বছরের স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, ব্যাঙ্কার ললিতের মুখে একটা দুঃখের ছায়া পড়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে ললিত বলল, 'তোর এই টপটা আমি আগে দেখিনি খুকু! নেক লাইনটা ভীষণ ডিপ!'

হোমীর মন পড়ে আছে 'নিয়তি' নামের সাধুটার দিকে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের রোমাঞ্চও অনুভূত হচ্ছে ধীরে ধীরে। বিবাহবার্ষিকী আজ না কাল— কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে তার! যেন কিছুটা আবছা দেখছে, এভাবে তাকাল হোমী ললিতের দিকে, 'না, এটা রিঙ্কিদিদি দিয়েছে!'

রিঙ্কির নাম শুনে নেকলাইন নিয়ে আর আপত্তি করতে দেখা গেল না ললিতকে। রিঙ্কি ললিতের একমাত্র দিদি। এমনিতে ললিত যতই বন্ধুভাবাপন্ন হোক না কেন সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওর অধিকারবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। যেমন সারা সপ্তাহে চোদ্দো ঘন্টা করে অফিস করলেও কোনও অভিযোগ করে না ও। দৃকপাত করে না হোমী কখন বেরোচ্ছে, কখন ঢুকছে, কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে। কিন্তু রবিবার কোনও কারণে অফিসে যেতে হলে হোমীকে, ললিতের মেজাজ বিগড়ে যায়। তখন ও বলে, 'সপ্তাহে একটা দিনও যদি একসঙ্গে না-কাটাতে পারি তা হলে আমরা বিয়ে করলাম কেন, বল তুই?'

শরীর দেখানো পোশাকের ক্ষেত্রেও কখনও-সখনও একগুঁয়েমি করে ললিত। ললিতের বন্ধুদের পার্টিতে হোমী যতই রিভিলিং পোশাক পরুক আপত্তি নেই ওর। কিন্তু হোমী যদি নিজের বন্ধুদের সঙ্গে, নিজের অফিসের পার্টিতে তেমন কিছু পরে যায়, ললিত কিছু চটাচটি করবেই! বলবে, 'বাহ্, দেখি! ভালই তো দেখাচ্ছিস খুকু আজকাল।' তা সত্ত্বেও হোমী বলতে পারে ললিতের মধ্যে স্বামী স্বামী ব্যাপারটা নেহাতই কম। ওই সাত দিনে এক দিনই প্রকাশ পায় হয়তো।

রেস্টুরেন্টটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা আজকে। অবিলম্বে খাবার এসে যায় তাদের। নরম ধোঁয়া-ওঠা প্রনের দিকে তাকিয়ে একটু-একটু আস্বাদনের সাধও জাগে হোমীর। ছিমছাম ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে ডাইনিং হলে। টুং-টাং ছুরি-কাঁটার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আলোও সেরকম— হিরণ্যবর্ণ কিন্তু ধার নেই।

ললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল হোমীর আবার। কেন এরকম হল? যদি হ্যালুসিনেশনই হবে তা হলেও আজকের দিনটাকেই বেছে নিল কেন সেটা? এই দিনটা চলে গেলে আর কি ফিরে আসবে জীবনে? তার কিংবা ললিতের জীবনে?

সে নিজেকে অনুরোধ করল আগ্রহের সঙ্গে প্রন তুলে দিতে ললিতের প্লেটে। কিন্তু তখনই তার মনে হল এই দিনটাও আসলে নিয়তি ছাড়া কিছু নয়! এ তার জীবনে ঘটতই যেমনভাবে ঘটছে! তার জীবন থেকে পাথর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসেনি দিনটা। সময়ের ঝড়-জলে পাথর ক্ষয়ে যাওয়ার মতো বেরিয়ে পড়েছে। অবধারিত এক মেন্টরের বদান্যতায় হচ্ছে সব! সেই মেন্টর— নিয়তি!

জীবনে প্রথম 'নিয়তি' শব্দটার মানে অনুধাবন করল হোমী। এবং সেই অশরীরী কিছুকে অনুভব করল শরীর ঘেঁষে। ঠান্ডা ঘরটার মধ্যে একটুও বাতাস নেই মনে হল হোমীর। সে কাশতে লাগল।

'আমি ডেজার্ট খাবনা, ললিত! আমাদের বারোটার আগে পৌঁছোতেই হবে!' এই বলে সে অশরীরী উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যেন তখন।

ললিত কী বুঝেছিল কে জানে, বলেছিল, 'দশ মিনিটে উঠব!'

যখন বেরোল তারা তখন আকাশ ভেঙে পড়ছে বৃষ্টিতে। এত বৃষ্টি শেষ কবে দেখেছে সে, মনে পড়ে না। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। গাছ ভেঙে পড়বে যেন। এত জোরে ঝাঁপ মারছে জল যে, মনে হচ্ছে উইন্ডস্ক্রিনই ভেঙে পড়বে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর ললিত তারস্বরে চালিয়ে দিয়েছে, 'ম্যায় চাঁহু তুঝকো বেপন্হা/ ফিদা হুঁ তুজপে মেরি জাঁ বেপন্হা'। গান ছাড়া এক মুহূর্ত গাড়ি চালাতে পারে না ও।

সে পাশে বসে 'ললিত, ললিত' বলে চেঁচাচ্ছে। ললিত হাসছে। ঝাপসা হয়ে যাওয়া রাস্তা কী প্রচণ্ড গতিবেগে পার হচ্ছে ছেলেটা, ভয় নেই, ডর নেই! আর নিয়তিও নেই যেন। সে বারণ করলে স্টিয়ারিং ছেড়ে

দিয়ে আগ্রাসী চুমু খাচ্ছে তাকে। মাঝে মাঝে ব্রেক কষছে এমন যেন উলটে যাবে গাড়ি।

ওদিকে সময় শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। এইবার উত্তেজনাটা টের পাচ্ছে হোমী। একটু একটু পারদ চড়ছে তারও ভেতরে। বারোটা বাজতে দশ। সে অস্থির হয়ে পড়ছে।

'পৌঁছোতে পারব?' রাস্তার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইছে সে। এখন তার গলার স্বর অনাদিকালের কোনও প্রেমিকার মতো শোনাচ্ছে।

ললিতের চোয়াল শক্ত, দাঁতে দাঁত, 'পৌঁছোবই!'

বৃষ্টির দাপট পার হতে হতে কমপ্লেক্সে পৌঁছোয় তারা যখন, তখন বারোটা বাজতে তিন। লিফট-টিফট ভুলে দৌড়ে তিনতলায় ওঠে দু'জনে। হোমীর হাত কাঁপতে থাকে। তার হাত থেকে চাবির গোছা টেনে নিয়ে দরজা খুলে তাকে ধাক্কা দেয় ললিত। আর ফ্ল্যাটে ঢুকেই টেনে নেয় বুকে। অমনি দেওয়ালঘড়িতে একটা মাত্র শব্দ করে রাত বারোটা বেজে যায় আর দুটো সবল হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখে ললিত! তারা জিতে যায়। বিশেষত হোমী।

বুক খালি করে বাতাস বেরিয়ে যায় হোমীর। চুম্বন করতে থাকে তারা। ঠোঁটে জড়িয়ে যায় ঠোঁট, জিভ, মনে হয় যেন ছাড়াছাড়ি হতে হতে আবার তারা নিজেদের ফিরে পেয়েছে— এত প্রগল্‌ভ সেই চুম্বন! এতই সমর্থিত! কিন্তু তারপরই হোমী দেখতে পায় অন্ধকার ব্যালকনিতে এক জটাজুটধারী, অর্ধউলঙ্গ মানুষের কালো ছায়া। ছায়াটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। ললিতের ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে থাকতে থাকতে হোমী তখন নিঃসাড় হয়ে যেতে থাকে।

বিবাহবার্ষিকী ও নিয়তিবাদের এক ঝলক

হোমী টের পেল 'নিয়তি' যেই হোক, যাই হোক— এর প্রতি এক ধরনের আসক্তি জন্মাচ্ছে তার। আভেনের নীল বলয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বোঝার চেষ্টা করছে আভেন জ্বালানোর পরে তার এবং এই আগুনের নিয়তি ঠিক কী?

বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে এখনও। গতকাল রাত থেকে অবিরাম। আকাশের রং-ও পাগলাটে। এবং পাপিয়া আসেনি। তাই আজ অফিস নেই জেনেও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছে না সে। কারণ আজ রাতে বন্ধুবান্ধব সহযোগে বিবাহবার্ষিকী পালন করার কথা আছে তাদের।

বাইরে বৃষ্টি। ফ্রিজ খালি, পাপিয়া অনুপস্থিত— উদ্‌যাপন ভেস্তে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা। সে কাজকর্ম কিছুই পারে না। বিশেষত রান্নাবান্না, ঘর গোছানো ইচ্ছে হলে যতটা সামলে নিতে পারে, 'করতেই হবে' পরিস্থিতি হলে বিন্দুমাত্র আত্মনিয়োগ অসম্ভব হয় তার। ভীষণ অভিমান হয় তখন হোমীর গোটা পৃথিবীর ওপর।

তারা বিবাহ করেছে কিন্তু সাংসারিক জীবনযাপন করছে কি না কে বলবে? হোমী আর ললিতের সংসারে নিয়মিত বাজারটাজারও হয় না। হলেও দরকারি জিনিসের তুলনায় অদরকারি জিনিসই বেশি কেনা হয়। ডিটারজেন্ট কিনতে গিয়ে হোমী কিনে ফেলে বাগান করার সরঞ্জাম। পোশাক, পারফিউম, ড্যাংগল্‌স কিনতেই অবশ্য সবচেয়ে ভাল লাগে তার। এ পর্যন্ত যতবার মাশরুমের প্যাকেট কিনে এনেছে ললিত, প্রতিবারই ধরে ফেলে দিতে হয়েছে। কেউ রাঁধেনি।

সে-ও কাজকর্ম পারে না, ললিতও পারে না। সে কুঁড়ে, ললিত অফিসের কাজ করতে ভালবাসে। দু'জনে বিয়ে করেছে একসঙ্গে থাকবে বলে— তার সঙ্গে সংসার করার সম্পর্ক নেই। যদিও দু'জনের মধ্যে ললিত অনেক বেশি দায়িত্বসচেতন, কম গোঁয়ার, বাস্তববাদী এবং সেন্স অফ হিউমারও নেহাত মন্দ নয়। হিন্দুস্থান পার্কের এই কমপ্লেক্সের সেকেন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটটায় গত এক বছর ভাড়া রয়েছে তারা। বড়জোর আরও দু' বছর থাকবে। ট্রায়াংগুলার পার্কের একটা নতুন কনস্ট্রাকশনে অলরেডি ফ্ল্যাট বুকিং সেরে ফেলেছে ললিত। চারতলায়। বারোশো স্কোয়ার ফুটের অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্ল্যাটটার দামের একের তিন অংশ টাকা ললিত ওর বাবার থেকে নিয়ে অ্যাডভান্স করেছে। বাকিটা হাউজিং লোন, যা শোধ করার জন্য ওর সামনে পড়ে আছে বিরাট জীবন।

ললিতরা দুই ভাই, এক বোন। ললিত ছোট। দাদা ললিতের চেয়ে অনেক বড়। ভাইঝিরই বয়স চোদ্দো এখন। ছোট থেকে হস্টেলে মানুষ হয়েছে বলে বাবা মা দাদা, বউদির সঙ্গে যোগাযোগটা কমই ওর। নিউ আলিপুরের বাড়িতে ললিত তাই ভাগ বসাতে চায়নি। সরাসরি বাবার থেকে নিজের অংশের টাকা চেয়ে নিয়েছে। কেউই আপত্তি করেনি তাতে। ললিতের দাদা প্রমিতের বউ মিতুলকে ললিতের বাবা-মা যেমন পছন্দ করেন, তাতে আর একটা বউ ওঁরাও আর পরিবারের অন্তর্গত করতে চাননি। তা ছাড়া ললিতের মা প্রথম

থেকেই হোমীকে পাত্তা দেবেন না ঠিক করে নিয়েছিলেন। তার অবশ্য কিছু অন্য কারণ আছে। হোমীর ব্যাকগ্রাউন্ড তাঁর সন্তোষজনক মনে হয়নি।

প্রথম-প্রথম ললিত নিউ আলিপুর যাচ্ছে শুনলে হোমী নড়েচড়ে বসে সালোয়ার-কুর্তা বাছত। বার কয়েক যাওয়া-আসা করার পর ললিত হাত নেড়ে বলেছিল, 'ছাড় তো, তোকে যেতে হবে না। দরকার পড়লে যাবি!' লাফিয়ে উঠে বরকে চুমু খেয়েছিল হোমী। শেষ কবে গেছে এখন তার মনেও পড়ে না! হোমী আর ললিতের লাইফস্টাইলে সংসার বিষয়টা অনুপান মাত্র। আর অনিবার্য হল, অপরিহার্য হল— প্রেম! প্রেম!

আজকাল সবাই বলছে পৃথিবীর কোনও রিসোর্স নষ্ট বা অপব্যয় না করতে। সেভ ওয়াটার, সেভ এনার্জি — এই এখন এনভায়রনমেন্টালিস্টদের সর্বক্ষণের মুখের কথা। আভেন অন করে চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ার জন্য হোমী নিজেকে ধিক্কার দিল। গত দু'সপ্তাহ ধরে নিজের লাইফ-স্টাইল শো-এর জন্য সে তো এই বিষয়ের ওপরই কাজ করেছে। অনুষ্ঠানটায় সে দেখিয়েছে কলকাতার টপ বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, করপোরেট বসরা নিজেদের জল ও শক্তি ব্যবহারে কী ধরনের কাটছাঁট আনার চেষ্টা করছে এবং কীভাবে সেটাই হয়ে উঠছে স্টেটাস সিম্বল!

পাপিয়া ট্রে-র ওপর চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখেই গিয়েছিল। রাতে কিচেন ব্যবহার হয়নি। হোমী চটপট চায়ের জল চাপিয়ে দিতে পারল। অন্যমনস্কতার জন্য এতক্ষণ যে-বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না সে— তা আবার পেল শুনতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে।

গতকাল রাতের যে ভীতিপ্রদ ঘটনায় স্নায়ু আঘাত পেয়েছিল তার, সকালের আলোয় সেই ঘটনা অনেকটাই মিথ্যে বলে ধরে নিয়েছে হোমী। যদিও সেই দুটো চক্ষুর কথা মনে পড়লেই বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তার। কিচেনের দেওয়ালে পিঠ চেপে রেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা— গতকাল রাতে ব্যালকনিতে তৃতীয়বারের জন্য লোকটাকে দেখেনি কি সে?

এই ত্রাস কোথা থেকে জন্মাচ্ছে তার ভেতরে? আর এই ত্রাসের প্রতিক্রিয়াই বা কী হতে চলেছে?

চা হাতে হোমী বেডরুমে গেল ললিতকে ডাকতে। গত রাতের যৌনতার পর আজ ভোরে আর সাড়াশব্দ করেনি, উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে ললিত এখনও। নগ্ন শরীরে। পেশিবহুল ফরসা পিঠটা নিশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। কাল ললিত এত পাগল হয়ে উঠেছিল যে, লক্ষই করেনি হোমী কত জড়সড় হয়ে গেছে এক তৃতীয় উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র। শুধু তো ভয় নয়— তারা মিলিত হচ্ছে আর কেউ দেখছে সেটা— এই অনুভূতিও ছিল। কী অসহায় বোধ করছিল সে তখন। কিন্তু ললিতকে আবার কিছু বলার সাহস হয়নি তার। একটা আঠাশ বছরের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছেলে কত সহ্য করবে? কত দেখাবে ঔদার্য? কিংবা এক অলীক অনুসরণকারীকে ঠেকাবেই বা কী করে? তাই চুপ করে ছিল হোমী। ললিত লোফালুফি করছিল তার শরীর নিয়ে, এক একটা ঝটকায় শুইয়ে দিচ্ছিল, ওপরে বসিয়ে নিচ্ছিল, দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল তাকে, সে জাদু পুতুলের মতো অঙ্গভঙ্গি করছিল তখন। ভেতরে কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না। ভেতরে ছিল না আলিঙ্গনের বদলে আলিঙ্গন ফিরিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ছিল না ঢেউ আছড়ে পড়ার প্রাক মুহূর্তে ললিতের হাত ধরে লাফিয়ে ঢেউয়ের মাথায় চড়ার ক্ষমতা। তীব্র আদরে মাখামাখি হতে হতে সে ভীষণ একা হয়ে পড়ছিল কেবলই।

গতকালের কথা ভেবে খারাপ লাগল তার। সে ললিতের পিঠে গাল চেপে ধরল। নিশ্বাসের ছন্দে সামান্য উঠল নামল তার মাথাটা। এভাবে একটুক্ষণ থাকার পরে পরেই ললিত জাগল। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে তাকে স্পর্শ করল ও, বলল, 'আয়, কাছে আয়!'

শক্‌ড হল হোমী এই 'কাছে আয়'টা শুনে। কীসের নির্দেশে টানটান উঠে দাঁড়াল সে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল যেন। দেওয়াল ধরে ধরে চলে গেল ঘরের এক কোণে। এত ভয়ার্ত হয়ে উঠল সে নিমেষে, যে ভাবল এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। নিজেকে সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং স্পেসের বেসিনে বারবার জলের ঝাপটা দিল মুখে। তখন ললিত ডাকল তাকে, 'খুকু, এই বৃষ্টি তো আজ থামবে বলে মনে হচ্ছে না!' বলল যেন আর্ধেক ঘুমের মধ্যে থেকে।

সে বিড়বিড় করল, 'তার জন্য আমি কী করতে পারি?'

'কী দাঁড়াবে লাস্ট অফ অল বোঝা যাচ্ছে না!' ললিত বোধহয় উঠে বসেছে। চা ঢালছে কাপে, 'খুকু?' তার ললিতের কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সে নখ খুঁটতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আরও দু'-একবার ডাকাডাকি করে ললিত চলে এল ডাইনিং স্পেসে। হাতে চায়ের কাপ, নগ্ন, ঠোঁটে সিগারেট। না-তাকিয়েও হোমী বুঝতে পারল কী অপ্রতিভ দেখাচ্ছে ললিতের নিম্নাঙ্গ এখন! যে ক্রিয়াসক্ত যৌনতা উপহার দেয় তাকে তার স্বামী/ প্রেমিক— তার মনে হল সেই খড়ের স্তূপে আগুন লাগার মতো দাউ দাউ সুখ আর কখনও পাবে না সে এর কাছ থেকে! ললিত বাহু ধরল তার, 'খুকু? ইজ এভিরিথিং ফাইন বেবি?'

কী এক হঠাৎ নির্দয়তায় ভর করে হোমী বলে উঠল এই সময়, 'শোন ললিত, আমি যদি কোনওদিনও তোকে ছেড়ে যেতে চাই তুই প্লিজ আমাকে কারণ জিজ্ঞেস করিস না! তুই চলে যেতে চাইলে আমিও..!'

ললিতের ভুরু দুটোয় রোষ আর কৌতুকের ভাঁজ পড়ল একটু সময় নিয়ে। কাঁধ উঁচিয়ে হাসল ও, 'গড'জ গ্রেট ইয়ার! আই থট আমরা আমাদের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে চলেছি। বাট উই আর টকিং অফ সেপারেশন ইনস্টেড! গ্রেট!'

ললিত মাথা নাড়তে লাগল বারবার, 'খুকু, আমি জানি তুই আনপ্রেডিক্টেবল, ভুলভাল, যা-খুশি তাই করিস — কিন্তু এত যে নিষ্ঠুর তা ক্রমশ জানছি!' বেডরুম সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকে দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

একটা-দুটো সেকেন্ড, তারপরই হোমী বুঝতে পারল মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছে সে। খুব অনুচিত কাজ করে ফেলেছে। এমন কিছু করে ফেলেছে যা আসলে করতে চায়নি।

কিছু না-করতে চেয়েও কিছু করে ফেলাটা কি নিয়তি? বলতে না- চেয়েও বলে ফেলাটা?

হোমী টয়লেটের দরজায় ধাক্কা দিল, 'ললিত, শোন আমি তোকে হার্ট করতে চাইনি। কাল থেকে আমার ওপর দিয়ে কী যাচ্ছে তা যদি তুই বুঝতিস!'

ভেতর থেকে ভেসে এল ললিতের স্বর, 'না, সত্যিই আর বুঝতে পারছি না।'

সে সত্যিই ভেঙে পড়ল, 'তুই তো কখনও এত রেগে যাস না!'

একটু চুপচাপ থাকার পর ললিত বলল, 'তুই শান্ত হয়ে বোস। সমালোচিত হলেই এত অস্থির হতে নেই। আমি বেরিয়ে কথা বলছি!'

পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে এল হোমী। কয়েকটা গাছ এনে এখানে রেখেছিল সে হর্টিকালচারাল গার্ডেন থেকে। ঠিকমতো যত্ন না-নেওয়ায় সব শুকিয়ে গেছে। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে জায়গাটা তাই। সাধুটাকে কাল সে এখানেই প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল টবগুলো পাপিয়া এলেই ফেলে দেবে। মৃত গাছগুলোর কাঠি কাঠি হাত-পা আর তার অনুসরণকারী যেন একই হেঁয়ালির অংশ— মনে হল তার।

বেডরুমে শব্দ পেতেই আবার ফিরে এল হোমী ললিতের সামনে। তাকে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে ললিত বলল, 'কীভাবে ম্যানেজ করবি, ভেবেছিস? বেরোতে হবে তো? খাওয়াবি কী গেস্টদের?'

ললিতের বুকের ওপর হাত রাখল হোমী, 'তুই বল। তুই যা বলবি আমি আজ থেকে তাই করব। আর আমি এভাবে পীড়ন করব না তোকে। উলটোপালটা কথা বলব না।'

'মনের কথা মনেই চেপে রাখবি?'

সে থমকাল। ললিত তার দুটো হাতকে জড়ো করে ধরল মুঠোয়, 'কিছু কিছু মেয়ে না পদ্মের মতো হয়— তাদের সাত খুন মাপ। তুই জ্বালা না কত জ্বালাবি, আমি জ্বলতে রাজি আছি!'

'আমি পাগল হয়ে গেলেও তুই আমাকে ছেড়ে যাবি না?'

'তুই পাগল হবি কেন?'

'ছোটবেলায় তো একবার হয়ে গেছিলাম, এটা সত্যি!'

ললিত ঠোঁট চাটল নিজের। ঠান্ডা আর কড়কড়ে হয়ে উঠল ওর চোখের ভাষা। হোমীর মনে হল ললিত তার একমাত্র অভিভাবক। সমবয়সি কিন্তু কত বড়!

'আমাদের প্রত্যেকের ছোটবেলাটাই আসলে একটা পাগলামি!' বলল ললিত, 'তুই শুধু একটা জিনিস মনে রাখবি, আমরা একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, একটা সুন্দর সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের একটা বাস্তবের দিক আছে, যুক্তি আর প্রমাণের জায়গা আছে। তুই শুধু সেই যুক্তির জায়গাটা ধরে রাখার চেষ্টা করবি— দেখবি, সব ঠিক থাকবে!'

তার চোখ ছলছল করছিল, 'আমি তোর মেয়ে, কেমন ললিত?'

'তুই আমার মেয়ে,' ললিত এতেও রাজি।

'আমরা আর কোনও মেয়ে আনব না!'

'না!'

'হ্যাপি অ্যানিভার্সারি!' তখনই বলল সে ললিতকে। বলতে পারল।

এর পরই তার মন ভাল হয়ে গেল। হাঁটুঝুল পাজামা, ঢোলা গেঞ্জি পরা হোমী মাথা ভরতি করে সিঁদুর পরে, দু' হাত ভরতি কাচের চুড়ি পরে, বিন্দি পরে, কানে ঝোলা দুল পরে, লিপস্টিক লাগিয়ে নাচতে শুরু করে দিল। নাচতে নাচতে বলল, 'শোন, হতভাগা পাপিয়া আসেনি! এদিকে ফ্রিজেও কিছু নেই, বৃষ্টি পড়ছে! কতজনকে ইনভাইট করেছিস সেই সংখ্যাটাও মনে নেই আমার।'

ছবি তোলাটা ললিতের একটা হবি, যা ভাল লাগে তা দেখেই হজম করে ফেলতে পারে না ও। ক্যামেরায় হোমীর ছবি তুলতে তুলতে বলল, 'তা হলে চল, বেরিয়ে যাই। বাজার করি! আদেশ আর টুলটুলও তো আসছে আজকে, হিউজ ক্রাউড। বোতল কত তুলতে হবে বল তো?'

হোমী বলল, ''আমি এরকম সেজেই যাব ললিত!'

'হ্যাঁ, একটা জিন্স গলিয়ে নে শুধু।'

এই সময় ফোন বেজে উঠল হোমীর— ডুব যা মেরে প্যায়ার মে।

'হ্যাঁ, মা বলো!' ফোন ধরেই বলল হোমী। প্রতিদিন ফোন করা চাই মা'র।

'কী করছ?' এই প্রশ্নটাও ধরাবাঁধা এবং কুরুচিকর।

নাচ বন্ধ হয়ে গেল হোমীর, ক্যামেরা অফ করে দিল ললিত, সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শরীরের নৃত্যকে মেরে ফেলে বিছানায় বসতে বসতে সে বলল, 'এই তো চা খেলাম।'

'কলকাতা তো ভাসছে খুকু। তোমার চ্যানেল দেখাচ্ছে। তোমার পিউ কাঁহা নিশ্চই আসেনি!'

'না, মা!'

'আমার মেয়েটি তো তিন দিন ধরেই বেপাত্তা! তিন দিন আজ নিয়ে, কোনও খবর নেই, সংবাদ নেই। সাহস ভাবো! হাউ ডেয়ার শি ডু দিস টু মি খুকু?'

সে চুপ।

'না, খুকু। যেই ঢুকবে ওকে পিছনে লাথি মেরে তাড়াব। শোনো, আই নিড সামবডি ইমিডিয়েটলি!' হুকুম করল মা।

'কাউকে পাওয়ার আগে কাউকে তাড়িও না মা। আজকাল হুট বলতেই লোক পাওয়া যায় না, জানো তুমি!'

'শোনো খুকু, এ যে কী বদমাইশ বলতে পারি না। নরম মলমলের কাপড়গুলো এমন পিটিয়ে কাচবে যে ফেটে যায়। কতদিন বলেছি...! সেদিন একটু নিমপাতা পেড়ে দিতে বললাম, গাছটাকে টেনে হিঁচড়ে বুড়ো বুড়ো সব পাতা পেড়ে দিয়ে গেল। আর রাতদিন এই চাই, ওই চাই। একটা কাপড় দাও, দিদির পুরনো জামা দাও! ভীষণ লোভী। খালি মাইনে বাড়াও। কত দিচ্ছি তাকে জানো কি? দুটি হাজার টাকা।'

যেন এর আগে যারা ছিল তাদের একজনও নির্লোভ, সৎ, ভাল ছিল মা'র ভাগ্যে!

'দ্যাখো মা...।'

'যাক গে যাক— তুমি তা হলে কী করছ আজকে? ক'জনকে ডেকেছ রাতে?'

মা'র কাজের লোকের প্রসঙ্গ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল দেখে অবাক হল হোমী।

'কিছু ঠিক করিনি! দশ-বারোজনকে বলা হয়েছে।'

'এমন সমবয়সিকে বিয়ে করে বসলে যে, ক্লাব মেম্বারশিপ পেতে পেতে এখন পাঁচ বছর, তাও পাবে কি না জানি না। একটা ক্লাব মেম্বারশিপ না-থাকলে চলে? রেস্টুরেন্টে কেউ যায়? আর হু উইল পে ফর দ্য হার্ড ড্রিঙ্কস? পনেরো জন মদ খেলে তো তিরিশ হাজার বিল হবে! খুকু, তুমি খাবার আনিয়ে নাও। মাইক্রোওয়েভে গরম করো আর খেতে দাও। বড়জোর একটা স্যালাড বানিয়ে নাও বাড়িতে।'

'তাই করতে হবে হয়তো, দেখি, সময় আছে হাতে।'

'আমি তো তাই করলাম। তিন দিন খাবার গরম করে করেই চালালাম। না খুকু, রান্নাবান্না আর আমার দ্বারা হবে না। সে তোমার বাবা যতই বিরক্ত হন, রাগ করুন!'

সে হাসল, 'বাবা আবার তোমার ওপর কবে রাগ করল?'

'কে বলেছে তোমায়? কাল একটু টেবিল পরিষ্কার করতে বলেছিলাম বলে গলা ফুলে গেল ওঁর!'

গলা ফুলে গেলে বাবাকে কেমন দেখাবে ভেবে পেল না হোমী। বাবার মুখটাই ঠিকমতো মনে পড়ল না তার এই মুহূর্তে। গলার স্বর পালটে কথা বলল মা, 'তুমি জানো মিস্টার ব্যানার্জির কথা বন্ধ হয়ে গেছে পরশু রাত থেকে? আজ বিকেলের ফ্লাইটে অলি আর তেজেন আসছে।'

সে চুপ করে শুনল।

'আর সার্ভাইভ করবে বলে মনে হয় না।' আবার বলল মা।

মিস্টার ব্যানার্জি মায়ের আগের পক্ষের স্বামী। কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়ে তিরিশ বছর বয়সে ডিভোর্স হয়ে যাওয়া স্বামী। সেই বিচ্ছেদের বয়সও তিরিশ। মা আবার বিয়ে করেছিল বাবাকে। সন্তান নেব কি নেব না করে জন্মও দিয়েছিল তাকে। মা'র বয়স এখন ষাট। অলি আর তেজেন মা'র আগের পক্ষের মেয়ে-জামাই। সে ভাবল যদি দু'বছর শয্যাগত থাকার পর মিস্টার ব্যানার্জি এবার মারাও যান তা হলে নতুন কিছু ঘটবে না মা'র জীবনে। তিরিশ বছর মা'র জীবনে যেভাবে প্রাসঙ্গিক ছিলেন ভদ্রলোক, সেভাবেই মা'র অন্তিম দিন অবধি অস্তিত্ব বজায় থাকবে ওঁর। মা'র সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জি ও তাঁর পরিবারের ঘৃণার যোগাযোগটা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। এবং মাঝখানে থাকবে অলি। মা'র প্রাণাধিক সন্তান।

এই যোগাযোগ কেমন তা সহজে অনুধাবনীয় নয়। এর বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন।

অলি, ফোনে, বম্বে থেকে—

'মা, তুমি জানো রাঙাপিসিমা আমার সম্পর্কে কী রটাচ্ছে?'

'কী অলি?' কিছু শুনে ওঠার আগেই চটে লাল হয়ে গেছে মা।

'বলেছে, আমি নাকি এবার এসে বাবার লকার খুলে সব কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। জুয়েলারি বের করে নিয়েছি। মা, তুমি বলো, ওসব গয়না নিয়ে আমি মাথা ঘামাই? ওদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওরা কাকে কী বলছে মা? ডোন্ট দে নো হু আই অ্যাম? আমার যা জুয়েলারি আছে তা রাঙাপিসিমা চোখে দেখেছে কখনও?'

অবশ্য অলির এই আস্ফালন সবই মিথ্যে। লন্ডনে পড়তে গিয়ে বম্বের এক অতি ধনী ও বিখ্যাত পরিবারের কোনও আত্মীয়কে বিয়ে করেছিল অলি। বয়স এখন চল্লিশ অলির, ওদের পরিবারের যা অর্থ তা 'প্রাচুর্য' শব্দটাকে অনেক পিছনে ফেলে দেয়। একটা প্রায় প্রাসাদের মধ্যে সংসার অলির। এবং তবু অলি এসে মা'র আলমারি ঘাঁটবে, গয়নার বাক্স ঘাঁটবে। গতবার হোমীর চোখের সামনে দিয়ে মা'র বারো গাছা মিনে করা খাঁটি সোনার চুড়ি কান্নাকাটি করে নিয়ে গেল অলি। একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পিতার সম্পত্তির জন্য অধৈর্য হয়ে আছে ও। মা বারবার প্ররোচিত করেছে অলিকে সমস্ত লিখিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি, যিনি খড়ম পরে ঘোরেন বাড়িতে, মানে ঘুরতেন— পেতলের ঘটিতে করে জল তুলে মাথায় ঢালতেন, সেদ্ধ ভাত খেতেন ও খান এবং চাকরবাকরদের সঙ্গে ছাড়া লোকজনের সঙ্গে বেশি বাক্যালাপেই যান না— তিনি দু'বছর শয্যা নেওয়া সত্ত্বেও এখনও সম্পত্তি হাতছাড়া করেননি। অলি চেষ্টা করে করে বিফল। মা'র ভয়, মিস্টার ব্যানার্জির বোনেদের এ ব্যাপারে হাত আছে। ওদের মন্ত্রণাতেই এমনটা করছেন ভদ্রলোক। মা'র চোখে সেই বোনেরা এক-একটা রাক্ষসী সব। একসময় মাকে ভুগিয়েছে। এখন অলিকে বঞ্চিত করে দাদার সম্পত্তি কুক্ষিগত করতে চাইছে।

অভিযোগের বান্ডিল খুলে বসে কাঁদবে অলি। অলির কান্না দেখে দুম করে ঘুসি মারবে টেবিলে মা, 'স্টপ ক্রায়িং অলি। স্টপ দিস ন্যাকা কান্না! নিয়ে থাকলে বেশ করেছ নিয়েছ এ কথাটা তুমি ওদের মুখের ওপর বলতে পেরেছ কি পারোনি বলো? যদি না-পেরে থাকো, তা হলে তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি। যাও, তুমি তোমার আদরের পিসিমাদের পায়ে ধরে বসে কেঁদে-কেঁদে ক্ষমা চাও! যা নিয়েছ সব ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

'আমি কিছু নিইনি মা,' বলবে অলি।

'তাই শোনাও তা হলে গিয়ে,' মা আরও রেগে যাবে।

'মা, রাঙাপিসিমা বলছে, বাবাই নাকি এটা জানিয়েছে ওদের। শুনেই বাবাকে ফোন করেছিলাম আমি। বাবা আমার একটা কথা শুনল না। বলল, 'অলি, আমি মরে না-যাওয়া অবধি এ-বাড়িতে পা রাখবে না। তুমি!' ভাবো মা, একমাত্র মেয়ের সঙ্গে এই ব্যবহার? এক মাস নিজের সংসার ভুলে কী সেবাটাই না করে এলাম বাবার! তার এই প্রতিদান? বাবা আমাকে এই কথা বলল?'

'বলল তো ভারী বয়েই গেল। তাতে এত কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার কিছু নেই! তোমার বলা উচিত ছিল তোমার সোহাগিনী বোনেরা কে দায়িত্ব নেবে আমাকে সংবাদটা পৌঁছে দেওয়ার? তারা তো সম্পত্তির দখল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে! কম জ্বালিয়েছে ওরা আমাকে? আর তোমার বাবা, বোনেদের ভেড়া! রূপ কি আমার কম ছিল অলি, কিন্তু তোমার বাবার চোখে ওঁর বোনেদের থেকে কেউ বেশি সুন্দর নেই জগতে! মা গো! আসলে কী জানো অলি, তোমার রাঙাপিসিমার ইচ্ছা সানি পার্কের ফ্ল্যাটটা মি. ব্যানার্জি ওর ছোট ছেলেকে দিয়ে যায়! তুমি বোকা, তুমি বোঝো না!'

আবার এই অলিরই সময়ে সময়ে মা'র হাতে কেমন লাঞ্ছনা জোটে তাও বিবরণযোগ্য—

'খুকু, তুমি জানো, তেজেন কলকাতায় অথচ আমি জানি না? আমাকে এভাবে অপমান করার মানে কী?'

'তাই? তেজেন কলকাতায়?'

অলি আর হোমী— পরস্পরকে কোনওদিনও পাত্তা দেয়নি। একটু বড় হওয়ার পর থেকে হোমী আর কথা বলে না অলির সঙ্গে। মা অবশ্য কখনও চেষ্টা করেনি দু'বোনের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করার। অলি আর হোমী যে শেষ অবধি একই মায়ের পেটের বোন এটা যেন কোনও তথ্যই নয়, তা ছাড়া হোমীর পাঁচ বছর বয়স যখন, তখনই তো লন্ডনে পড়তে চলে গেছিল অলি। তারপর বিবাহ ও শ্বশুরবাড়ি গমন। অলির বিয়েটা আজও মনে আছে হোমীর। নামীদামি লোকজন, মন্ত্রী-সান্ত্রিরা এসেছিল সেই বিয়েতে। মা বাবাকে টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিয়েছিল পুরী। আর পাঁচ-সাতটা দিন আয়ার মেয়ের সঙ্গে খেলা করেই কাটিয়ে দিয়েছিল হোমী।

বেলভেডিয়ার রোডের বাড়িতে অলি যখন থাকতে আসত ছেলেমেয়ে নিয়ে, তখন তিনতলায় নিজস্ব ঘরটায় গিয়ে ঢুকত সে। পারতপক্ষে বেরোত না।

মা'র মধ্যে তখনও সেই লড়াই চলছে। অলি মা'র? না অলি ব্যানার্জি পরিবারের? তাই অলি এলে হোমী নিজের অস্তিত্বসহ হারিয়ে গেলেও তার খোঁজ পড়ত না। অবশ্য অলি তো অলিই, জমিদারবাড়ির মেয়ে, চোখ ঠিকরোনো রূপ, লন্ডনে পড়াশোনা করেছে। পাটিলদের 'বহু'!

অলির সঙ্গে হোমীর তুলনা? হ্যাঁ, তাদের মা-ই যা এক, কমন। এবং সেই মা'র প্রোফাইলও বড় মেয়ের সঙ্গেই বেশি ম্যাচ করে কারণ মা-ও ব্যারিস্টারের মেয়ে। লরেটো কনভেন্ট, দার্জিলিং-এর ছাত্রী, পিতার

সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী, বেলভেডিয়ার রোডের বাড়িটা তো মা'র বাবার। হোমীর অধ্যাপক বাবাকে বিয়ে করে মা ওই বাড়িতেই তুলেছিল। সেই অধ্যাপক অলিকে পড়াতে এসেছিল প্রথমে। আর সেখানেই হোমীরও জন্ম। তবে বরাবর হোমী এবং বাবা— মা'র আশ্রিতের জীবন যাপন করেছে। পোষ্যের জীবন যাপন করেছে। তারা মা'র স্টেটাসের অন্তর্গত নয়!

অলি এবং মা আসলে সেই পরিবারেরই অংশ, যে-পরিবারের কেউ কেউ এখনও রেগে গেলে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'দারোয়ান দিয়ে বের করে দেব!' 'গুলি করে মারব?'— এইসব। মিস্টার ব্যানার্জি নাকি এরকম রাগারাগি পর্বের পরে এসরাজ বাজাতেন। তিরিশ বছর আগে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পরিবারের কথাই বলতে সবচেয়ে ভালবাসে মা। সে তাতে যতই ঘৃণা মিশে থাকুক। বাবা বা হোমীর সম্পর্কে মা'র বলার কিছুই নেই!

মোট কথা হল তেজেনকে হোমী তেজেনই বলে। অলিকে অলি!

'তা তেজেন কলকাতায় তুমি জানতে পারলে কী করে?' বলবে সে।

'সুখেনের কাছে জানলাম খুকু!' সুখেন মি. ব্যানার্জির খাস চাকর। কিন্তু মায়ের চর। সানি পার্কে কখন কী ঘটছে তার সব খবরাখবর মাকে দেওয়া সুখেনের অন্যতম কাজ।

'তেজেন কেন কলকাতায় তা যদি শুনতে!' মা টগবগিয়ে ফুটছে।

'কেন?' প্রশ্ন করা ছাড়া হোমির উপায় নেই।

'মান ভাঙাতে খুকু— মি. ব্যানার্জির মান ভাঙাতে। অলি পাঠিয়েছে তেজেনকে। 'বাবা আমার ওপর রাগ করেছে। আমাকে ঢুকতে দেবে না বলেছে। বাবাকে বোঝাও!' পাঁঠাটা তাই শ্বশুরকে বোঝাতে এসেছে। অলির তো 'গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব!' আমি তো চিনি আমার মেয়েকে। বাবার সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে অলির ঘুম হচ্ছে না। একদম ওই ফ্যামিলির মতো স্বার্থপর, বদমাইশ ও, খুকু! এবার যখন ও মেয়ের কাছে গেল কত করে অনুরোধ করলাম, 'আমার হাঁটার জুতোটা একটু এনো অলি!' গতবার যেটা এনে দিয়েছিল সেটাই তো এক বছর চালালাম। সেদিন হাঁটতে গেছি, রঞ্জনা পোদ্দার বলল, 'চেঞ্জ ইয়োর শু মিসেস ব্যানার্জি, এরকম জুতো পরে হাঁটবেন না, তলাটা ক্ষয়ে গেছে!' আমি তো হেঁ-হেঁ করে হাসলাম। কী বলব, মেয়ে বলেছে, 'সরি মা, এবার আনার জায়গা হল না, নেক্সট টাইম!' কী এত এনেছে ও, খুকু, যে মা'র জন্য এক জোড়া জুতো আনার জায়গা থাকে না? বছরে যে কতবার যাচ্ছে— আর শুধু কিনছে আর কিনছে। কিন্তু সব নিজের জন্য! কত বড় অপদার্থ ভাবো! ব্লাডি বিচ!' অলির মেয়ে দ্যুতি ইটালিতে ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে গেছে। আর হোমীর বাবা নবব্রত দত্ত হলেও, হোমীর মা কুড়ি বছর বয়স থেকে যে মিসেস ব্যানার্জি সেই মিসেস ব্যানার্জিই আছেন।

'আসলে কিপটে খুকু! এক পয়সা হাত দিয়ে গলে না!' যেন মা মোটেও কিপটে নয়। একটা রান্নার লোক রাখবে না। হোল টাইমার ড্রাইভার রাখবে না। রাখলেও কারও সঙ্গে দু'বেলার বেশি পোষাবে না মায়ের। ঝগড়া করবে, অভিযোগ করবে, গালাগালি করবে। এই অভিযোগ শুনতে শুনতে বড় হয়েছে হোমী। এই অভিযোগ শুনতে শুনতে বৃদ্ধ হয়ে গেছে তার বাবা। কবে থেকে দেখছে হোমী বাবা দরজা বন্ধ করে বসে থাকে ঘরে, বেরোয় না। কথা বলে না, খায়ও না! শরীর চর্মসার, চোখ ঘোলাটে, হাত-পা কাঁপছে। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ!

মা বলে, 'উনি তো পাগল। আমি বুঝতে পারিনি। চুপচাপ বিয়ে করে আমার ঘাড়ে উঠে এলেন।'

হোমী মা'র কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। আর বাবাকে তার ভীষণ ঘেন্না করে। রাগ নয়, সহানুভূতি নয় — ঘেন্না। কারণ সে জানে বাবা মোটেই পাগল নয়। একটা আস্ত বদমাইশ। আত্মপর, কুঁড়ে, ফাঁকিবাজ। আসলে বাবা এভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল। মাকে বিয়ে করে ঢুকে গেছে এরকম বেঁচে থাকায়। এখনও বাবার ঘরের দরজা বন্ধ থাকে সবসময়, বাবা শুয়ে থাকে এক খণ্ড কাঠের মতো নোংরা বিছানায়।

মা'র সঙ্গে আধঘন্টা কথা বললে নিজেকে শ্রান্ত মনে হয় হোমীর। সে আর নিতে পারে না আজকাল। ললিতের যত্ন তাকে বদলে দিয়েছে অনেক। তার ইচ্ছে করে যতটা সম্ভব ললিতের ছায়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে, শান্ত আর স্নিগ্ধ থাকতে। ললিত জানে যে, কত বিধ্বস্ত বোধ করে হোমী নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে। তার দুর্মুখ মাকে ললিতের ঘোর অপছন্দ, ললিত জোর করেনি কখনও কিন্তু হোমী জানে বেলভেডিয়ার রোডের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হোক তাই চায় ও।

'খুকু, আমাকে ডেন্টিস্টের কাছে কবে নিয়ে যাবে? এভাবে কতদিন ভুগব আমি?' নিজের প্রয়োজনের কথাটা এতক্ষণে জানাল মা।

'হ্যাঁ, পরশু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। সন্ধে সাড়ে সাতটা। তুমি ড্রাইভার বলে রাখো।'

'আর ড্রাইভারের কথা বোলো না। সেদিন একজন এল..' হোমী কান বন্ধ করে ফেলল। তার ইচ্ছে করল ফোনটা ছুড়ে ফেলে দেয়, 'অবশ্য অলি এসে পড়ছে আজকে, দ্যাখো, এদিকের কী অবস্থা হয়। বেশি দিন টিকবে না। আমার তো ভয় করছে খুকু— অলি এসে এমন বাড়ি মাথায় করে কান্নাকাটি শুরু করবে। বাবা, বাবা, করে নালে-ঝোলে হয়ে যাবে। শি অ্যাক্টস সো ওয়েল, কিন্তু যা হাতাবার তো হাতিয়েইছ। এখন আবার অত কাঁদার কী? লকারে তো কিছুটি পড়ে নেই। কথাটা তো সত্যিই। সুখেন বলেছে আমায়, সেবার মি. ব্যানার্জির অসুস্থতার সময় অলি লকার খুলে সব নিয়ে গেছে। গিন্নির কত গয়না যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন উনি— সব এখন অলির।' গিন্নি মানে মা'র এক্স শাশুড়ি।

ললিতের সঙ্গে তার বিয়েতে ঘোর অসম্মতি ছিল মা'র। এবং সেই সময় 'সত্যম'-এর অতুল কাশ্যপ প্রেমে পড়েছিল তার। অলির মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব। ললিতের সঙ্গে ঝগড়া করে একদিন অতুলের সঙ্গে ডেটেও গেছিল হোমী। এর সাত দিনের মাথায় বোধ হয় ললিতকে সে বিয়ে করে নেয়। মা'র তো ভুতুড়ি বেরিয়ে গেছিল সে সংবাদে। অবশ্য দশ বছর আগে হলে কী হত কে জানে? বয়সটা তো একটা ফ্যাক্টর বটেই। কথা বলতে বলতে মা আজকাল হাঁপায়, একটু একটু হাঁপায়।

ললিতের সান্নিধ্যে হোমীর জীবনছন্দ আলাদা। মা'র ফোন ছাড়ার পর সেই জীবনে ফিরতে সামান্য সময় লাগল তার। কিছুটা পরামর্শের পর ঠিক হল আজ বাইরে থেকেই খাবারদাবার আনিয়ে নেওয়া হবে। ললিত বিকেলে বেরোবে গাড়ি নিয়ে। পানীয়ের ব্যবস্থা করবে, স্ন্যাকস নিয়ে আসবে। তারপর আবার একবার বেরোবে ডিনার তুলতে। এসব কথাবার্তার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলল হোমী, মাস্টার্ড সস্ মাখানো সালামি স্যান্ডউইচ। পাপিয়া এলে লুচি খেত তারা আজ। দুপুরে লাঞ্চে কী খাওয়া হবে, এই প্রসঙ্গ উঠলে সে এমন আড়মোড়া ভাঙল যে, ললিত তুড়ি দিয়ে বলে উঠল, 'খিচুড়ি! আমি কুক করব।' বিশেষ কিছু কাজ নেই। যারা

আসবে তারা মূলত ললিতেরই বন্ধু। কলেজের। অফিসের। সেদিক থেকে দেখলে হোমির নিজস্ব কোনও বন্ধু নেই। তার সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক। কিন্তু অন্তরঙ্গতার একটা নির্দিষ্ট স্তরের পর কারওই সঙ্গে আর বেশি এগোতে পারে না সে। বন্ধুত্ব যখন সম্পর্ক হয়ে ওঠে তখন ভীষণ দাবিদাওয়া বেড়ে যায়, দেখেছে হোমী। আর কোনও ব্যাপারেই কমিটমেন্ট ভাল লাগে না তার। তা হলে সে চাকরিটা করে কী করে?— করে, করতে পারে কারণ, সেখানে সৃষ্টিশীলতার একটা পরিবেশ সে তৈরি করতে পেরেছে নিজের জন্য। সেখানে তার কাজে কেউ নাক গলায় না।

হোমী একটু ডাস্টিং করে, ভাল বেডকভার পাতল বিছানায়। ড্রয়িং রুমের সোফার কুশনগুলো একটু গুছিয়ে রাখল। ফ্রিজে জল ভরল বরফের জন্য। টয়লেটে ফ্রেশনার রাখল, কাচা তোয়ালে রাখল। যৎসামান্য যা ক্রকারি আছে তার, তাই ক্যাবিনেট থেকে পেড়ে মুছেটুছে রাখল ডাইনিং টেবিলে। তারপর ঢুকল স্নান করতে।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সবে শ্যাম্পু করবে বলে চুল ভেজাচ্ছে সে, বাথরুমের দরজা ধরে টানাটানি, 'খোল!'

'কী হয়েছে?'

সে দরজা খুলে দিল।

'কী করছিস?' গলার অ্যাডামস্ অ্যাপেল নাচিয়ে প্রশ্ন ললিতের। সঙ্গে একমুখ হাসি। হোমী ভাবল, বাচ্চা ছেলে একটা। খুব বড় বড় ভাব দেখায়।

হোমীর খুব ঠান্ডা লাগার ধাত।

'ওমা, কী আবার করব?' বলে দরজা খোলা রেখেই সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শাওয়ারের উষ্ণ জলের নীচে।

ললিত চটপট পোশাক ত্যাগ করে নগ্ন হয়ে ঢুকে এল বাথরুমে।

'আমি তোকে শ্যাম্পু করে দিচ্ছি খুকু।'

'আর তোর খিচুড়ির কী হল?' সে ভুরু নাচাল।

'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ!' বলল ললিত। কাছে চলে এল একেবারে। ভিজতে লাগল।

'যা! তুই আমার চোখে শ্যাম্পু ঢুকিয়ে দিবি!'

'আই ওন্ট! আই সোয়্যর!' বলল ললিত।

সে দেখল শ্যাম্পু-ট্যাম্পু কিছু না, ললিতের ঠোঁট দুটোয় লাল রং ধরেছে। বোঝাই যাচ্ছে শরীরে এই মুহূর্তে সর্বাধিক হারে সঞ্চালিত হচ্ছে রক্ত। এবং যাবতীয় আশা, আকাঙক্ষা, কামনা, বাসনা, প্রেম ছুটে এসে আশ্রয় নিয়েছে ছোট্ট একটু জায়গায়। প্রতি মুহূর্তে তা আরও দৃঢ় হচ্ছে। আর স্পর্শ করছে হোমীর তলপেট, জঙ্ঘা, ঊরু, নিতম্ব। দুটো মেদহীন, তারুণ্যে ভরপুর, চর্চিত, দীর্ঘ দেহকাণ্ড— যে-কোনও অবস্থায় রমণের জন্য তৈরি যেন একে অন্যের সঙ্গে।

একসময় টয়লেটের বেজ-রঙা মার্বেলই কোল দিল দু'জনকে। আর তখনই ঘটল ঘটনাটা। ললিতের মাথা বুকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হোমী হাতড়াতে লাগল আর... আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল— সে অবচেতনে খুঁজছিল অন্য কিছু— জটা, রুদ্রাক্ষের বেড়ি, একটা অতিকায় মস্তক। একটা বিপুল ভারী মাথা। সত্যস্কন্ধ যার।

যার তুলনায় ললিতের মাথা কিছু নয়, হালকা। মসৃণ। নাব্যতা হীন। কিংবা শূন্যও বলা যায়। হঠাৎ তার খুব খাপছাড়া লাগল নিজের কামতাড়না। মনে হল বরাবর সে একটা যৌনতাময় মস্তক খুঁজেছে কিন্তু পায়নি! রুদ্র, বীতশোক কিংবা ললিত— কেউই সে যা চেয়েছে তার উৎক্ষেপণ ঘটাতে পারেনি। তার কল্পনা কল্পনাই থেকে গিয়েছে— কল্পনার অভ্যুত্থান বা চরিতার্থতা, কোনওটাই ঘটেনি! সে দেখল তার ললিতের সম্পর্কে অনুভূতিগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। সে ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

এক রতিমগ্ন স্নানের পর খিচুড়ি খেয়ে ললিতের পাশেই শুয়েছিল হোমী। তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল ললিত। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে, তার ফোন। এক ধরনের আচ্ছন্নতার মধ্যে চলে গেছিল সে, টেনেহিঁচড়ে তুলল নিজেকে। দেখল মনটা কী ভার হয়ে আছে! পাঁচটা বাজে, বৃষ্টি নেই। বুকের ওপর বই, ললিত ঘুমোচ্ছে। সে প্রবল বিরক্তির সঙ্গে ফোন ধরল। আবার এখন কি তাকে অলির গল্প শুনতে হবে? নাকি মি. ব্যানার্জি ফাইনালি ডায়েড?

'বলো মা!' বিরক্তির সঙ্গে বলল হোমী, 'খুকু...! খুকু...! উনি কেমন করছেন!' বলে উঠল মা, সে বুঝতে পারল না— কে?

'খুকু, তোমার বাবা! কেমন করছেন! পড়ে গেছেন খাট থেকে, চোখ স্থির! মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে!'

হোমী চিৎকার করে উঠল, 'ললিত! ললিত!'

নিয়তির অভিসার

তৈরি হয়ে বেরোতে হোমী আর ললিতের লাগল সাত-আট মিনিট। গাড়িতে বসে তাদের পুরোনো হাউস ফিজিশিয়ানকে ফোন করল হোমী। মা আগেই করেছে। ডা. ঘোষ বললেন, 'এইমাত্র মি. দত্তকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স। তোমরা সোজা নার্সিংহোমে চলে এসো। আর মিসেস ব্যানার্জিকে আমি বাড়িতেই থাকতে বলেছি হোমী। আই থিঙ্ক শি'জ নট নিডেড দেয়ার!'

'বাবা কি বেঁচে আঙ্কেল?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, এখনও বেঁচে!'

ললিত বলল, 'আয়েষাকে ফোন করে দে!'

হোমী দ্রুত হাতে বোম টিপল, 'আয়েষা, মাই ফাদার ইজ সিরিয়াসলি ইল! আমরা নার্সিংহোমে যাচ্ছি! পার্টি ক্যানসেল করতে হচ্ছে!'

'অবভিয়াসলি হোমী,' বলে উঠল আয়েষা।

'তুমি আমার একটা কাজ করে দাও— প্লিজ কল আপ এভরি ওয়ান! আমার হয়ে!'

'কিছু ভেবো না, ব্যস্ত হয়ো না! এনি হেল্প?'

'দরকার হলে বলব!'

নার্সিংহোমে পৌঁছে আধঘণ্টার বেশি লাগল ফর্মালিটিস সম্পূর্ণ করতে। ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ির মধ্যেই তারা জানতে পারল ডাক্তারদের অনুমান সেরিব্রো ভাসকুলার অ্যাটাক হয়েছে বাবার। এম.আর.আই হতে গেছে বাবা। বাহাত্তর ঘণ্টা না-কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না! ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন আইসিইউ-তে ঢোকানো হচ্ছে বাবাকে, তখন প্রায় বছরখানেক পরে বাবার মুখটা ভাল করে দেখল হোমী।

আইসিইউ-এর সামনের করিডরে ডা. সুখময় ঘোষের সঙ্গে দেখা হল তাদের।

'শোনো হোমী,' বললেন তিনি, 'বিরাট ক্রাইসিস। এবং সেটা সামলাতে হবে তোমাকেই। সব চেষ্টা শুরু হয়েছে। দেখা যাক কী হয়! যে-কোনও ইনফর্মেশন আগে আমাকে জানাবে। আমি কনসালটান্টের সঙ্গে কথা বলব। ও কে?'

ললিতকে নিয়ে চলে গেলেন ডা. ঘোষ। বসার জায়গা ফাঁকা নেই। ভিড়। হোমী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, শরীর টানটান, চোখ খটখটে শুকনো। 'বাবা' বললেই যে অসার ছবির প্রিন্টগুলো মনে ধেয়ে আসে— তার মুখ এ-জীবনে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এক হৃতগর্ব পুরুষ, পিতা কিন্তু অভিভাবকত্বহীন, সুদর্শন কিন্তু কাপুরুষ, কর্মবিমুখ এবং যিনি কোনওদিনই হোমীকে দেননি স্নেহের বাতাবরণ, উৎসর্গ করেননি একবিন্দু ভালবাসা, বই মুখে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসে থেকেছেন। একদিনের কথা মনে আছে হোমীর— বাবার দরজা খোলা দেখে সে এগিয়েছিল ঢুকতে, বাবা তখন পাজামা ছাড়ছিল, রোগা দুটো পা, তাকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বাবা, সে শুনেছিল শ্লেষ্মাজড়িত গলা পরিষ্কারের কর্কশ ঘৃণ্য শব্দ!

এই যে সে ছুটে এসেছে এর কোনও মানে নেই আসলে, ব্যক্তিগত কোনও অনুভূতি নেই, সে এখন বাবার ব্যাপারে মানসিক এক শূন্যতার শিকার, এবং সে জানে বাবা থাকলে বা চলে গেলে কারও কিছু যায় আসে না। এমনকী বাবারও না!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল পুরো ব্যাপারটার মধ্যে বিভিন্ন রকম নিয়তির একই রকম সংযোজন আছে। মানে একটা জড়ানো-মড়ানো ব্যাপার। ধরা যাক বাবার অসুস্থতা— এ তার নিয়তি, তার বাবার নিয়তি, তার মা'র নিয়তি! মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বাবা লোকটাকে ঘিরে এ তো গোটা পৃথিবীরই নিয়তি। ওই যে ভদ্রমহিলা, নার্স— বাবার শয্যার পাশে ড্রিপ চালাচ্ছেন, বাবার অসুস্থতা তো তাঁরও নিয়তি। কারণ বাবার অসুস্থতা তো নার্সের জীবনেও কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে। এদিকে ওই ভদ্রমহিলার জীবনের সব ঘটনাই তো ভদ্রমহিলার নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ঘটে থাকে। তা হলে কি প্রত্যেকের নিয়তিই এক? প্রত্যেকটা ঘটনা যেমন একটাই ঘটনা, সেরকম? তা হলে ওই ভয়াল চেহারার সাধু যে বলল, সে তার নিয়তি? তার একার নিয়তি?

এসব ভাবতে ভাবতেই মি. ব্যানার্জি আর মি. দত্তের মধ্যে একটা মৃত্যু-নির্বাচন ঘটে কি না এই কথাটা মাথায় এল তার। মি. ব্যানার্জির শেষ সময় অনেকদিন ধরেই ক্রিপ করে করে এখন প্রায় দোরগোড়ায় হাজির। অন্য দিকে মি. দত্তের হাতে রয়েছে বাহাত্তর ঘণ্টা। অথচ কাল পর্যন্ত লোকটার কোনও অসুখ ছিল না তেমন, মি. ব্যানার্জির তুলনায় বয়সও কম। কিন্তু এখন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

মা'র অতীত ও বর্তমান স্বামীর কোন জনকে মৃত্যু আগে গ্রহণ করবে? এদের প্রত্যেকের নিয়তি একে অন্যের জন্য কীভাবে লড়বে বা সহযোগিতা করবে? তার বাবা নাকি তার হাফ সিস্টারের বাবা— হেরে যাবে কে? নাকি অদ্ভুত নিয়তির বশে দু'জনেই বেঁচে উঠবে আবার, বা জাস্ট বেঁচে থাকবে?

একটা সোফা খালি হতে সেটায় গিয়ে বসল হোমী। এবং বুঝতে পারল চাপা কান্নার মতো 'নিয়তি' শব্দটা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে তার বুকের ভেতর। কুরে কুরে খাচ্ছে। এক দীর্ঘ শরীর, প্রশস্ত ললাট সাধুর কুহক ঘিরে রেখেছে তাকে সর্বক্ষণ এবং তার ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। তার শরীরের পাশে একটা ভারী বাতাসও যেন সেই পরোক্ষ অনুভূতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা!

ছুটোছুটি যা করার ললিতই করল। হোমী বসে রইল চুপচাপ। কফি খেল, বেরিয়ে সিগারেট খেল, ফিরে এসে চেয়ার হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মা তাকে ফোন করল যতবার, সে কোনও আশার কথা শোনাতে পারল না। মা বলল, 'খুকু, আমার মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। ওনাকে ওরকম দেখে পর্যন্ত আমার সমস্ত গা-টা কেমন করছে! ওদিকে গাছের কাঁঠাল সব এমন পেকেছে যে, গন্ধে পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে। এক্ষুনি একটা লোক ডেকে সব পাড়িয়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম। কিন্তু লোক কোথায় পাব? এদিকে এক কাপ চা করে দেওয়ার লোক নেই। নীচের ভাড়াটেদের চাকরটাকে বললাম, দে না বাবা, একটু চা করে দে না! এই তো অবস্থা— সবই তো দেখছিস। এমনিতে তো খুব মাজি-মাজি করিস। এবেলা আর খোঁজ নেই? তা বিনয়ের অবতার, বলল এক্ষুনি চা পাঠাচ্ছে— তা কোথায় কী? এদিকে খিদেতে পেট জ্বলছে, দুপুরে তো ওই একটু...!' মা হাঁপাচ্ছে।

সে বলল, 'অলি নেমেছে মা?'

‘ও এয়ারপোর্ট থেকেই সানি পার্ক চলে গেছে। খুকু, তুমি ওখানে কী করছ? তুমি আমার কাছে চলে এসো। ললিত তো রয়েইছে!’

গেলে সে অন্য কোথাও যাবে— মা’র কাছে যাবে না! কাঁঠালের গন্ধের মধ্যে যাবে না! দৈববশত যাবে যেখানে যাবে। সে নিয়তিকে মেনে নিতে শুরু করেছে। যে নিয়তি বিবাহবার্ষিকীর দিন তাদের নার্সিংহোমে বসিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ— এ সবই প্রিডেস্টিনড্!

মা’র কাছে যাবে না ঠিক করেছিল— কিন্তু যেতে হলই। রাত দশটা নাগাদ ললিত আর সে বেরিয়েছিল খেতে। খেয়ে ফিরবে আবার ওয়েটিং এরিয়ায়, পেশেন্টদের অজস্র উদ্বিগ্ন আত্মীয়, বন্ধুদের সঙ্গে বসে, ঢুলে রাত কাটাবে। ললিত বলেছিল, ‘তুই মা’র কাছে যা, আমি থাকছি!’ সে রাজি হয়নি।

কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্ট থেকে স্যান্ডউইচ, কফি খেয়ে সে কিছু বলার আগেই মা’র জন্য স্যান্ডুইচ প্যাক করাল ললিত। তারপর দু’মিনিট দূরের বেলভেডিয়ার রোডে গেল তারা। একতলার চাকরটা খুলে দিল ফটক, দোতলার কোলাপসিবল গেটের চাবি আছে তার কাছে, অবশ্য শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এল মা-ই। নোংরা একটা পাজামা আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসেই মা আবার ঢুকে গেল ভেতরে। হাউসকোট চাপিয়ে এল। ললিত যখন কথা বলছে মা’র সঙ্গে, তখন এক ফ্লাস্ক কফি বানিয়ে ফেলল হোমী। একটু খেতে দিল মাকে।

মা বলল, ‘উনি কি আর সারবেন খুকু? নাকি অথর্ব হয়ে, হাত-পা পড়ে বেঁচে থাকবেন? বিছানায় হাগবেন, মুতবেন? কে করবে ওঁকে খুকু?’

ললিত বলল, ‘ইটস্ টু আর্লি টু থিঙ্ক অফ অল দ্যাট আন্টি। সেরকম হলে সেন্টারের ট্রেন্ড নার্স, আয়া আসবে। ডোন্ট ওরি— আপনাকে কিছু করতে হবে না!’ এককালে মা’র চোখধাঁধানো রূপ ছিল। রূপের ‘রূপ’টা ঝরে গেছে কিন্তু তীক্ষ্ণতাটা রয়ে গেছে। ঠোঁটের পাউট শুকিয়ে গেছে কিন্তু ঢেউ খেলানো রেখায় রয়ে গেছে মারাত্মক সব মুদ্রা! মা সেরকমই মুদ্রা করল একটা।

‘কী জানো তো ললিত, দুপুরে ঘুমোতে দেবে না!’

আগে আগে মা’র কথা শুনে হয়রান হয়রান চোখমুখ করে ললিত তার দিকে তাকাত। এখন বেশিক্ষণ টলারেটই করতে পারে না!

তারা যখন বেরিয়ে আসছে, তখন মা বলল, ‘তোমাদের বাড়ি কদ্দুর? ভাড়া বাড়িতে আবার মানুষ থাকে।’ এই সময় অলির ফোন এল বলে কথাটা আর এগোল না।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ললিত বলল, ‘দুর্দান্ত মহিলা! আমেজিং! ইনক্রেডিবল্!’

হঠাৎ খুব হাসি পেল তার। সে হাসতে লাগল ফুলে ফুলে।

আইসিইউ-এর সামনের লাউঞ্জে প্রায় সারারাত বসে থাকল হোমী আর ললিত পাশাপাশি। ললিত তখন বসে বসেই ঘুমোচ্ছে। অন্যান্য পেশেন্ট পার্টিও ঘাড় বাঁকিয়ে নিদ্রামগ্ন। একজন-দু’জন পায়চারি করছে, টয়লেটে যাচ্ছে। হঠাৎ সাদা সাদা বড় বড় সিলিং থেকে ঝুলে থাকা আলোগুলোর নীচে চতুর্থবারের জন্য অদ্ভুতদর্শন সেই সাধুকে আবার পরিষ্কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। চাউনি, অবয়ব, চোয়াল, কাঠামো— ব্যাখ্যাতীত এক উপস্থিতি! মুহূর্তে ভয়ে, আতঙ্কে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে গেল হোমী। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে করল, লোক জড়ো করতে ইচ্ছে করল, ললিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। হাত,

পা, আঙুল পর্যন্ত নড়ল না। লুব্ধ, পিশাচ চোখ মেলে লোকটা তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে মনে সে নিজেকে বলতে লাগল, 'পালাও, পালাও হোমী, পালাও!' কিন্তু শরীরের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনও সচলতা এল না। এবং হাত বাড়াল জটাধারী তার দিকে, আজানুলম্বিত হাত! মনে হল ছুঁয়ে ফেলবেই। গতকাল সে জানত না এ তার নিয়তি, তাই রেগে উঠতে পেরেছিল। আজ সে জানে এর পরিচয়! সাংঘাতিক পরিচয়! সে বলতে চাইল, কেন? কেন? কেন এভাবে পিছু নিয়েছ আমার? আমি তো জীবনের উদ্দেশে এমন কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিইনি যে, আমাকে তুমি নস্যাৎ করে দিয়ে দেখাতে চাইবে তুমি কে? আমার কাছে বিবাহবার্ষিকী পালন বা না-পালন দুটোই সমান, আমার কাছে মিস্টার ব্যানার্জি বা মিস্টার দত্ত— দু'জনের মৃত্যুই একতরফা ঘটনা একটা, এমনকী যদি ললিতকেও হারাতে হয় তা হলেও আমার তোমাকে কিছু বলার নেই, আমার তো তেমন কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, পৃথিবী ঘোরার স্বাদ নেই, বিস্ফোরণে মরে যাওয়ার দুশ্চিন্তা নেই। কোনও কিছুর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ নেই আমার, যেখানে যা ঘটছে তা ঘটুক না!' এই অবধি বলেই সে বুঝতে পারে কোথাও একটা কনট্রাডিকশন হচ্ছে কথায় আর ব্যবহারে। সে শুধরে নেয় নিজেকে, 'হ্যাঁ, তুমি আমার পিছু নিতেই পারো, আমার তাতেই বা কী আপত্তি? আমি ভয় পাচ্ছি তোমাকে, কিন্তু বেশ, ভয় পাব! ভয় পাব! হ্যাঁ, ভয় পাব!' এই বলতে বলতে সে দেখে, ক্রমশ আরও বীভৎস হয়ে উঠছে লোকটার চোখ। গোঁফ-দাড়ির ভেতর থেকে ক্ষুধার্তের মতো ঠোঁট নড়ছে! সে প্রাণপণ চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং তখন কেউ নাড়া দিয়ে ডাকে তাকে। বয়স্ক, গম্ভীর এক নার্স।

'খুব অদ্ভুতভাবে আপনার বাবার জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ওঁকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি কাচের বাইরে থেকে একবার দেখতে পারেন!'

সে এগোয় কিন্তু ফোন বেজে ওঠে তার, 'খুকু, মি. ব্যানার্জি এইমাত্র চলে গেলেন!' বলে মা।

হোমী দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্ফুটে বলে, 'ও!' চারপাশে তাকিয়ে আর দেখতে পায় না ওই সাধুকে তখন!

মা বাবার কথা জিজ্ঞেস করল না কিছু, বলল, 'খুকু, অলি খুব জেদ করছে। ও চায় এই সময় আমি ওর পাশে থাকি।'

একটা মেয়ে তার মাকে অনুরোধ করছে তার বাবার মৃত্যু-উত্তর সময়ে পাশে থাকতে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু তো নেই। অনেকদিন পরে সে খোলা মনে কথা বলল মা'র সঙ্গে, 'তুমি নিশ্চয়ই যাবে মা!'

'কিন্তু এত বছর বাদে কী করে সানি পার্কে যাব আমি খুকু? অত বড় গুষ্টি ওখানে থাকবে— শয়তানিগুলো! বড় বউ! বিশ্ব ঢঙি! সব চোখ দিয়ে ভস্ম করবে আমাকে।'

'তুমি তো ওদের কাছে যাচ্ছ না!'

'নিশ্চয়ই না! আমার মেয়ের আমাকে দরকার। শি ওয়ান্টস্ টু হোল্ড মাই হ্যান্ড, শি নিডস্ মাই শোল্ডার টু ক্রাই অন। আফটার অল আ ডেথ্ ইজ আ ডেথ্ খুকু!'

হোমী বাবাকে দেখল দূর থেকে। ভাই, বোন, মামা, কাকা, মাসি, পিসি— বাবার কেউ কোথাও আছে বলে জানা নেই তার। তবু হয়তো বাবা বেঁচে যাবে। সন্ধেবেলা সে নিয়তির, ভাগ্যের খেলা দেখতে প্রস্তুত হয়েছিল। মি. ব্যানার্জি মারাই গেলেন। বাবার ক্ষণিকের জন্য ফিরে এল জ্ঞান, যদিও জীবন না মৃত্যু— তার নিষ্পত্তি হয়নি!

একটি আশ্চর্য প্রেম

দশ দিন পরে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে পৌঁছে হোমীর মনে হল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তার ঠিক পিছনে পিছনে হাঁটছে। তার হাঁটার গতি কমে বা বেড়ে গেলে অনুসরণকারীর গতিও সেই হারে কমে বা বেড়ে যাচ্ছে। কে তা জানত হোমী— তাই সে পিছনে ফিরে তাকাল না!

তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। দু'দিন হল ট্যুরে গেছে ললিত। ফিরতে ফিরতে দিন দশেক। অফিসে যাওয়ার পথে ও বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে সে একাই আসছে বাবাকে দেখতে। একাই কথা বলছে ডাক্তারদের সঙ্গে। ওষুধপত্র যা দরকার কিনে আনছে। উদাস মুখে বসে থাকছে লাউঞ্জে। দেখছে বিকেল হতে না-হতে ভিজিটরদের ঢল।

দশ দিন হয়ে গেছে বাবার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। হাত-পা নাড়ছে না, তাকাচ্ছে না, চোখ অর্ধনিমীলিত, কথা নেই মুখে, শব্দই নেই, কিন্তু অজ্ঞান নয়! ঘুমোচ্ছে, গভীর ঘুম, যেন দেহে সে অর্থে কোনও অবসাদই নেই বাবার। ভয়ংকর শান্তিপূর্ণ এই ঘুমই চেয়েছিল যেন বাবা বহুকাল ধরে। ললিত ছাড়া কেউ খবরও নিচ্ছে না বাবার এখন। মা বলেছে, 'তুমি যা ভাল বোঝো করো খুকু!'

এই সময়টায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে প্রচুর ট্র্যাফিক। ছুটে যাচ্ছে বড় বড় বাস, মিনি বাস, সিগনাল লাল হচ্ছেই না। এগিয়ে পিছিয়ে হোমী চেষ্টা করল পার হওয়ার। ঠিক এই মুহূর্তে আশেপাশে কোনও পথচারী নেই। ধোঁয়া-ধোঁয়া হলুদ আলোয় ভেসে যাওয়া অতিকায় পথে দাঁড়িয়ে থাকতে এক অদ্ভুত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি হয়। অথচ সেই অনুভবের রেডিয়ামের মধ্যে ধরা পড়ে যে, সে কোনও জন্মেই একা ছিল না। তার সঙ্গে একজন ছিল সব সময়ই, এখনও আছে ও থাকবে। মাত্রাহীন অলীক এক উপস্থিতির সঙ্গে জীবননির্বাহ করতে হবে তাকে। অনুসরণকারী কি সেদিনের মতো আজও মুখোমুখি দাঁড়াবে, 'মহারানি' বলে ডাকবে?— ভাবল হোমী। তার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না এখন লোকটাকে নিয়ে! ট্যাক্সি না ধরে আলিপুর জেলের দিকের প্রায় অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে লাগল সে। হ্যাঁ, পিছনে আবার পদশব্দ— এ দিকটা একটু ঝোপঝাড় আছে। লোকটা ঝোপঝাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটছে। সে দাঁড়াল, হাঁটল, দাঁড়াল, হাঁটল। একসময় জেলের পাঁচিল বরাবর বাঁদিকের সরু রাস্তাটায় বেঁকে গেল। প্রতি মুহূর্তে সে ভাবল রুদ্রাক্ষ জড়ানো হাত এক্ষুনি কাঁধ স্পর্শ করবে তার। আর হোমী জানতে চাইবে, 'কী এর পর?'

কত দূর হেঁটে এল সে, নিজেই বুঝল না। একসময় লক্ষ করল ভিড়ে ঠাসা জগুবাজারের সামনে পৌঁছে গেছে। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল হইচই চিৎকার চেঁচামেচি ঠেলাঠেলির মধ্যে দাঁড়িয়ে। সোয়া আটটা বাজে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, অফিসে ফিরতে হলে রাস্তা আবার পার হতে হবে। তার ক্লান্ত লাগল ভীষণ, বাতাস এত গুমোট, আকাশে প্রতীক্ষারত মেঘ— বৃষ্টি হবেই! না, আজ আর অফিসে ফিরবে না! নাকি ফিরবে?

বাড়িতে গিয়েই বা করবে কী? সে এদিক-ওদিক শিশুর মতো তাকাল। যেন কোথাও কোনও বিলবোর্ডে লিখে রাখা আছে নির্দেশ। কারণ তার কিছু আর চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। মাথা জুড়ে গৈরিক কৌপিন পরা, নীল কম্বল জড়ানো এক পুরুষ। যার গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে! চকচকে! যে সত্যিই দুর্ধর্ষ রূপবান। কিন্তু কদর্য নোংরা!

এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে একটা ভাঙাচোরা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তার। অনেক ঝড় বৃষ্টি রোদ তাপ সহ্য করে ঝুলে থাকা। অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখনী তাতে। 'মি. বেদ— পামিস্ট— এভরি ইভনিং। 7 টু 10' সাইনবোর্ডের ওপর ঝুলে থাকা টিমটিমে বাল্বটা যেন সে তাকিয়ে দেখছে দেখেই দপদপ করে উঠল দু'বার। অমনি গুমগুম, গুড়গুড় শব্দ করে মেঘ ডাকল। সাইনবোর্ডের ওপর ঠিকানা ছাড়াও রয়েছে একটা মোটা তিরচিহ্ন। তিরচিহ্নের মুখেই একটা অসম্ভব সরু গলি। গলিটায় উঁকি মেরে দেখল হোমী। সেটা গলি নয় আদৌ। তিনটে বাড়ির যৌথ প্রবেশপথ মাত্র।

সময় নষ্ট না-করে সে ঢুকে পড়ল গলিটায়। এগোতেই দেখল ডান হাতের বাড়িটার সদরের ওপর ওই একই সাইনবোর্ড ঝুলছে। আর দরজাটা হাট করে খোলা। পুরনো বৈঠকখানাটাই পামিস্টের চেম্বার। সামনে কতগুলো বেঞ্চ পাতা। পিছনে একটা কাঠের পার্টিশন। সম্ভবত ওর পিছনেই বসে নিভৃতে হাত দেখেন মি. বেদ। টিমটিমে আলো, চটা ওঠা লাল-কালো মেঝে— অনেকটা অতীত কোনও হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির মতো বিষাদময় পরিবেশ! নির্জীব!

পায়ে পায়ে সে প্রবেশ করল চেম্বারে, সেখানে একটাও লোক হাত দেখাবার জন্য বসে নেই। তা হলে কি আজ ভদ্রলোক অনুপস্থিত?

দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে দেখল হোমী— জিন্স, কুর্তি, চামড়ার ঢাউস ব্যাগ— ভীষণ বেমানান এখানে সে। কিন্তু তার দু'চোখে উপচে পড়ছে কৌতূহল। সে নিজের সম্পর্কে জানতে চায়! হয়তো তার জুতোর শব্দই জানিয়ে দিল সে এসেছে— পার্টিশনের ওপাশ থেকে একটা গম্ভীর গলা ডেকে উঠল, 'চলে আসুন!' এগিয়ে গেল হোমী।

এক মাথা ফিনফিনে পাকা চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে। কিন্তু সিলিং থেকে ঝুলে থাকা অত পুরনো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ঘুরতে থাকা পাখার তুলনায় মি. বেদের চুলগুলো উড়ছে অনেক বেশি। মনে হচ্ছে একটা অন্য ধরনের বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মাথায়। প্রৌঢ়ের চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা, গায়ে জড়ানো-মড়ানো একটা পোশাক। সে শিহরিত হল, বলল, 'আমি হাত দেখাতে চাই!'

'বসুন!' বললেন মি. বেদ।

বড়সড় টেবিলটার ওপর পড়ে আছে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, একটা নোটবই, একটা পেনসিল। ব্যস, আর কিছু নেই। টেবিলের এ-পাশের কাঠের চেয়ার টেনে হোমী বসে পড়ল আস্তে আস্তে।

'হাতটা দিন! ডান হাতটা দিন!'

ডান হাত? হাত বাড়াতে বাড়াতে সে বলল, 'আমার নাম, জন্ম-সময় এসব জানতে চাইলেন না মি. বেদ?'

ভদ্রলোক তাকালেন, 'আপনার জন্মেরও আগে আপনার হাতের রেখা তৈরি হয়ে গেছে ম্যাডাম। আর পৃথিবীতে কোনও কিছুরই সঠিক কোনও নাম আছে বলে মনে হয় আপনার? নাম তো ভাষার বিষয়— তাই না?'

মি. বেদ দু'হাত দিয়ে ধরলেন তার ডান হাত। কী গরম সেই হাত! সে যেন ছ্যাঁকা খেল। ঝুঁকে বসল অমনি। ভদ্রলোক বললেন, 'বলুন কী জানতে চান?'

'আপনি যা দেখতে বা পড়তে পারছেন আমাকে একে একে বলুন। আসলে আমার নির্দিষ্ট করে কিছু জানার নেই। আমার শুধু নিজের সম্পর্কে একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে অনুসন্ধানের!'

'তবু প্রশ্ন করুন!'

'আমি কে মি. বেদ?'

'আপনি একজন স্বশিক্ষিত মানুষ, সেল্ফ টট্— যার জীবনে কারও কোনও প্রভাব নেই! কোনও ইনফ্লুয়েন্স নেই!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মি. বেদ।

'কারও কোন ইনফ্লুয়েন্স নেই?' সে যারপরনাই অবাক হল।

'না, নেই!'

'বাবা, মা, বন্ধু, প্রেমিক— কোনও সম্পর্কের কোনও প্রভাব নেই আমার ওপর?'

'বললাম তো— মানুষের ভেতরে অপর মানুষের যে-প্রভাবক্ষেত্র সেটাই আপনার নেই ম্যাডাম। আপনি কাউকে পর বা আপন বলে মানেন না, ভাল কিংবা মন্দ ধরেন না, ভালবাসেন না, শ্রদ্ধা বা ঘৃণা করেন না— আপনি স্বীকারই করেন না অন্যকে। আপনার জগতে আপনি একা!'

'বেশ!'

'এই আপনার ফেট লাইন। এই দেখুন— লাইনটা শুরু হয়েই কেমন থমকে গেছে, শেষ হয়ে গেছে।'

'তার মানে আমার ফেট লাইনই নেই মি. বেদ? আমার কোনও ভাগ্য নেই? ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, নিয়তি নেই?'

'আছে। ভাগ্য নিশ্চয়ই আছে।'

'তার আগে বলুন আমার জীবনে কোনও পুরুষ আছে কি?'

'সেদিক থেকে দেখলে আপনার জীবনে কেউ-ই নেই!'

'প্রেম নেই?'

'না, প্রেম নেই। এই যে আপনার হাতের অ্যাফেকশন লাইনগুলো, এগুলো একটাও গভীর নয়। কেমন অনিচ্ছায় তৈরি হয়েছে। আপনার আয়ুরেখা লম্বা কিন্তু ক্ষতবিক্ষত, তবু সেই আয়ুরেখা ধরেই বলছি, এই সময়ে একটা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেই বন্ধন আপনার কাছে কিছুই নয়! স্নেহ মায়া মমতার বন্ধন নয়, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কও শেষ হয়ে আসছে।'

'কী বলছেন আপনি?' ললিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে আসছে?

'এই দেখুন, এই রেখাটাকে দেখুন। এই রেখাটা বলছে একটা প্রেম আছে আপনার জীবনে— কিন্তু সেই প্রেম আপনার জন্মমুহূর্তের প্রেম। জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছে। এমন জিনিস আমি অতীতে কখনও দেখিনি কারও হাতে।'

হোমী কেঁদে ফেলছে, 'জন্মমুহূর্তের প্রেম? এ কি হতে পারে মি. বেদ?'

'এই আপনার হেড লাইন। আপনার প্রেম আপনার হেড লাইনের দিকে বেঁকে গেছে— মানে এই প্রেমই আজীবন আপনাকে চালাবে।'

'আরও সব বলুন আপনি— আমার সাকসেসের কথা বলুন, শত্রুদের কথা বলুন, সুসময়, দুঃসময়, অর্থ, সন্তান এসব বলুন।'

'আপনার শত্রু নেই। সু বা কুসময়ও নেই। সন্তান নেই। সাকসেস বা অর্থ? এর কথা আমি বলতে পারি না। সাফল্য বা অর্থের মূল্য এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে হোমী। একটা নিঃসাড় কাঠের টুকরোর মতো পড়ে থাকে তার হাত, মি. বেদের সামনে। প্রৌঢ় গড়গড় করে বলতে থাকেন, 'আপনার আসল ফেট লাইন থেমে গেছে ম্যাডাম আর এই এখান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে একটা কাল্পনিক ভাগ্যরেখা। যে-মাউন্ট থেকে তা শুরু হয়েছে সেটা ইমাজিনেশন মাউন্ট। তার মানে আপনার ভাগ্য আপনার কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। মানে আপনি যেভাবে কল্পনা করবেন সেভাবেই এগোবে আপনার জীবন। অথচ আপনার সমস্ত কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করবে আপনার ভাগ্য — খুবই জটিল ব্যাপার সন্দেহ নেই! এদিকে ভেনাস মাউন্ট থেকে একটা অতি গভীর রেখা বেরিয়ে, দেখুন কীভাবে কামড়ে ধরেছে আপনার কল্পিত ভাগ্যরেখাকে? তার মানে আপনার জীবনের যাবতীয় যৌনতাও কাল্পনিক। প্রেমও।'

সে একটাও কথা বলছে না। বলতে পারছে না।

'আপনার জীবনটাই একটা কাল্পনিক ব্যাপার ম্যাডাম।'

অনেকক্ষণ পরে সে বলছে, 'আমার বিয়েটা টিকবে না? কোনও কারণ তো নেই না টেকার? আমরা তো খুব ভাল বন্ধু। ললিত ভীষণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং।'

'না, টিকবে না। আপনার জীবনে সব সাময়িক।'

আকাশ ফাটিয়ে বাজ পড়ল একটা। এত ভেতরের এই বৈঠকখানা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ল আলোর ঝলকানি। এতক্ষণে শুরু হল বৃষ্টি। শব্দ শুনে মনে হল জোরালো বৃষ্টি হচ্ছে।

হোমীর তন্ময়তা ভাঙতে চায় না। সে ফিজ জানতে চায়। কিছুই না, পঞ্চাশটা টাকা মাত্র। টাকাটা টেবিলে রেখে সে উঠে দাঁড়ায়।

'আপনি নিয়তি মানেন মি. বেদ?'

'নিশ্চয়ই। ভাগ্য, নিয়তি— সব একই ব্যাপার।'

'কাকে বলে নিয়তি বলুন তো?'

চেয়ারে হেলে বসতে বসতে কেমন একটা হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। অন্য কোনও পৌরাণিক চরিত্রের মতো দেখায় ওঁকে তখন। ঠোঁটের দু'পাশ ভাঁজ খেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। চোয়াল উঠে আসছে। বলেন, 'নিয়তি কোনও বড় ব্যাপার নয়। বিরাট বিরাট দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, অত্যাচার, শোক, দুর্ঘটনাই নিয়তি নয় শুধু। নিয়তি প্রতিটা এক পা, দু'পা পদক্ষেপ। আপনি ঘুম থেকে উঠে একটা হাই তুলবেন, আড়মোড়া ভাঙবেন— এও আপনার নিয়তি— বুঝেছেন? কিংবা ধরুন আপনি হাওড়া থেকে আজ রাত দশটায় ট্রেন ধরবেন, এবার সেই ট্রেন আপনি ধরতে পারবেন কি পারবেন না— এটা আপনার নিয়তি। মানে নির্দিষ্ট। যদি ধরতে পারেন, যদি যাওয়া হয়ে ওঠে, পৌঁছোনো হয়ে ওঠে— তা হলে ধরতে পারাটা প্রিডেসটিন্‌ড! যদি কোনও কারণে যাওয়ায় বাধা পড়ে, পথে দেরি হয়, তা হলে ধরতে না-পারাটাও প্রিডেসটিন্‌ড। কোনও কিছুর দ্বারা এই ডেসটিনিকে আপনি খণ্ডন করতে পারবেন না। আপনার সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনা আপনাকে আপনার

নিয়তির দিকেই এগিয়ে দেবে। কোনও প্রয়াস, কর্ম, সাধনা, তাবিজ, কবজ, তেলপড়া, জলপড়া, গ্রহ, রত্ন আপনার নিয়তিকে বদলাতে পারবে না। এই যে আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে 'আপনি কে' এই প্রশ্ন জাগতই। এবং যেদিন, ক্ষণ, বারে জেগেছে, তখনই জাগত। এও নিয়তি আপনার।'

'তা হলে যে বলা হয় ম্যান ইজ দা মেকার অফ হিজ ডেসটিনি? বড় বড় লোকেরা যে তাই বলেন? বলেন কর্ম যেমন করবে তেমন ফল ফলবে।'

'এটা একটা খুব অসহায় অবস্থা ম্যাডাম। যে কর্ম করছে সে তো নিয়তিবশতই করছে। করতে তাকে হবেই।'

'তা হলে প্রেম কী?'

'যোগাযোগ। কনসিকোয়েন্স। কে কখন কোন অবস্থায় কাকে মিট করছে, বা হয়তো মিট-ই করছে না— সাত বছর ধরে পাশাপাশিই ছিল, প্রেম হয়নি। একদিন হঠাৎ হচ্ছে, কিছু অনুভূতি হচ্ছে, সেও কনসিকোয়েন্স। রাগ হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে— সবই প্রিডেসটিন্ড।'

একটা অব্যক্ত চিৎকার ওঠে হোমীর বুক জুড়ে, 'আমার নিয়তির হাত থেকে বুঝি আমার মুক্তি নেই কখনও মি. বেদ?'

'আপনার নিয়তি আপনি নিজেই।'

এক ছুটে বেরিয়ে আসে হোমী বাইরে, রাস্তায়। দেখে অনেক রাত হয়ে গেছে। কত তা বোঝা দায়। পথের দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বাসগুলো, ট্যাক্সিগুলো। সে ভিজে যেতে থাকে। এবং তাকাতেই দেখে অদূরবর্তী গাছের তলায় কম্বলে নিজেকে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নিয়তি তার। জটা ভিজে গেছে। শান্ত মুখশ্রী। যেন সত্যিকারের যোগী কোনও। চাউনির মধ্যে আজ বাসনা, বিকারের থেকে স্বতন্ত্র কিছু। প্রেম?

এক অতুলনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরুষ— যেন মহান বিচারক। হোমী সেই মুহূর্তেই প্রেমে পড়ে যায় লোকটার। আর বুঝতে পারে এ সেই জন্মমুহূর্তের প্রেমের মতো প্রেম। ঠিক যেমন বলেছেন ওই পামিস্ট। নিজের প্রতি অসম্ভব ঘৃণা হয় তখন তার।

নিয়তির সংযোজন

সে ছিল মেধাবী ছাত্রী। তাই সংশয়বাদী। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কেই ছিল তার গভীর খটকা। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তার মূল্যবোধ ছিল এই সংশয়, কোনও কিছুকেই সে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পারত না এবং জানত যে সব প্রশ্নেরই একাধিক উত্তর সম্ভব। সে যখন কাউকে পছন্দ করত তখনও সংশয়জনিত পছন্দ হত সেটা। ভালবাসা, ঘৃণা করা বিষয়েও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করত ক্রমাগত নিজেকে। এবং বিশ্বাস বা অবিশ্বাস— এই দুটো জিনিস কখনও পুরোপুরি আসত না তার। প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে তার যেন মনে হত, সে কি সত্যিই ঘুমন্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল?

কিন্তু সেদিনের পর জীবন বদলে গেল তার। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে পরিশ্রান্ত হোমী বাড়ি ফিরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করামাত্র ফ্রিজের মাথার ওপর রাখা তার আর ললিতের যুগল ছবিটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল— ললিতের প্রতি তার যাবতীয় অ্যাটাচমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। সংশয়াতীতভাবে শেষ হয়ে গেছে।

ললিত ফিরল রবিবার কাকভোরে। হোমী উঠে সুদূর অনন্তস্পর্শী চোখে তাকাল ললিতের দিকে। সেই চোখ অবশ্য ললিত দেখতে পেল না। ও তখন ঢুলছিল। অনেক লেট ছিল ফ্লাইট। পৌনে এগারোটার জায়গায় প্লেন আকাশে ওড়ে রাত আড়াইটের পরে, মুম্বইয়ের আকাশ তার আগে পর্যন্ত ঝড়-ঝঞ্ঝায় পরিপূর্ণ ছিল বলে এই দেরি।

ললিত পোশাক বদলাল আর ঢুলে পড়ল বিছানায়। হোমী সকালে উঠে নিজে ব্রেকফাস্ট খেল। ললিতের ব্রেকফাস্ট টেবিলে গুছিয়ে রেখে অফিসে বেরিয়ে গেল। রবিবার তার অফিস থাকে না। কলিগদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে হোমী ঢুকে গেল নিউজ রুমে। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। কাজ করতে লাগল।

প্রায় আড়াইটে নাগাদ ফোন এল ললিতের,'তুই কোথায়?' তখনও গলায় ঘুমের জড়তা।

'অফিসে।'

ললিত থমকাল যেন, 'অফিস? কেন?' বিশ্বাসই হল না ওর। একে রবিবার, তার ওপর দশ দিনের ট্যুর শেষ করে ফিরেছে ও। এরকম সময়ে হোমী অফিসে?

'কখন ফিরবি?' বিরক্ত ললিত প্রশ্ন করল। ওর ঘুম চটে গেছে।

'বাবাকে দেখে,' উত্তর দিল হোমী।

'তোর কী হয়েছে খুকু?' জানতে চাইল ললিত।

'কই, কিছু না তো?'

'আঙ্কল কেমন রে?'

'স্টেবল। কিন্তু কোনও উন্নতি নেই।'

'সরি, আমি দু'দিন ভাল করে খোঁজ নিতে পারিনি খুকু। আর কতদিন রাখবে, বলেছে কিছু?'

'নাহ্, তবে এখন ছাড়ার প্রশ্ন নেই।'

'খুকু, আমার মনে হয় ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছি, তোকে আদর করিনি তাই রেগে গেছিস না তুই?'

'ওসব কিছু নয়। রিল্যাক্স।'

'আজ না-বেরোলেই তো পারতিস।'

'তুই সবসময় এটাই বলিস ললিত। এর কোনও মিনিং আছে? দরকার পড়লে তো বেরোতেই হবে। তুই বেরোস না? হাউ ক্যান ইউ ডিমান্ড সামথিং লাইক দ্যাট?' তার পাশে বসে কাজ করছিল সুহাস। হোমীর গলার স্বর চড়ে যেতে ঘুরে তাকাল একবার।

'ডিমান্ড?' বলল ললিত, 'ও কে।'

ফোন ছেড়ে দিল।

বিকেলে নার্সিংহোমে পৌঁছে হোমী দেখল মা এসেছে। ইতিমধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং আরও কত হবে, তারই একটা মুখে মুখে হিসেব করতে লাগল মা। সে শুধু অপেক্ষা করছিল ডাক্তার আসার। বাবাকে দেখার কিছু নেই। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে বলেই সে বসে আছে। মাকে সে বলল, 'তোমার চিন্তার কী মা? বাবার যেখানে যা আছে তাই দিয়েই চলুক না।'

'তারপরে? খুকু, এর পিছনে কত যাবে ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া?'

'অনেক যে যাবে, তা বুঝতে পারছি। প্রতিদিনই পনেরো হাজার করে লাগছে প্রায়।'

'তা হলে? তুমি জানো, আমাদের লিকুইড মানি আর কতটুকু আছে?'

'তুমি তো আমাকে কখনও বলোনি।'

'তুমি জানতে চেয়েছ কখনও বুঝি? তুমি কি আমাদের দিকে কখনও ঘুরে তাকিয়েছ?'

তার হঠাৎ মজা করতে ইচ্ছে হল মা'র সঙ্গে, 'সেরকম হলে তুমি বাড়ি বিক্রি করবে! কেজরিওয়ালের এত বড় অফার আছে!'

'হাউ ডেয়ার ইউ!' লাউঞ্জ-ভরতি লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল মা, 'ওটা আমার বাবার বাড়ি। ওই বাড়িতে আমি জন্মেছি। ওই বাড়ি আমি কখনও বিক্রি করব না।'

'শোনো মা— টাকাপয়সার সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে। ইটস আপ টু ইউ। আমার এ বিষয়ে কিছু করার নেই। আমি যেটা করতে পারি, তুমি বললে, এখান থেকে অপেক্ষাকৃত চিপ কোথাও ট্রান্সফার করাতে পারি বাবাকে বা বাড়ি পৌঁছেও দিতে পারি।'

মা তাকে দেখল আপাদমস্তক, 'তাই করো। তাতে উনি বাঁচেন বাঁচবেন।'

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে যখন বেরোল হোমী, তখন মা চলে গেছে। কাল মি. ব্যানার্জির পারলৌকিক কাজ। ওদিকে অলির সঙ্গে এমন লেগেছে মি. ব্যানার্জির পরিবারের যে, শ্রাদ্ধে তাঁরা কেউ উপস্থিত থাকবেন না জানিয়ে দিয়েছেন। অলি তাই মাকে ধরেছে, মাকে থাকতে হবে।

'শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপার, মাথার ওপর বড়রা কেউ না-থাকলে চলে? আমি তো বললাম অলিকে, তোমার পিসিদের কাউকে আর তুমি পাচ্ছ না অলি। এখন আর ওদের কীসের স্বার্থ?' বলল মা। কাল তাই মা সানি

পার্কে মি. ব্যানার্জির কাজে প্রেজেন্ট থাকবে সকালে।

মা বা অলিকে নিয়ে ভাবছিল না হোমী। কোনওদিনই ভাবেনি। সে ভাবছিল, ললিতের কোনও ফোন আসেনি সেই কথাবার্তার পর থেকে মনে মনে হোমী প্রস্তুত ছিল বিকেলে নার্সিংহোমের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে ললিতকে। এমনটা যে আশা করেছিল, কারণ সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক হত ললিতের পক্ষে। তার মান-অভিমান, রাগ, ক্রোধ, অবুঝপনা, নিজের সমস্ত উষ্ণতা ও আবেগ দিয়ে সামলেছে ললিত এতদিন। হোমী কত ভুল করেছে— বুঝেও ললিত গায়ে মাখেনি সেসব। আজও তাই হবে জানত সে, ললিত আসবে, তার মুখের দিকে তাকাবে বারবার। তারপর এখান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে কোথাও।

ললিতকে সে আর ভালবাসুক না-বাসুক— এটা, এটুকু তার দরকারও ছিল খুব।

ললিতের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরে এল হোমী। চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল। দেখল সমস্ত ফ্ল্যাটটা অন্ধকার। ললিত বাড়িতে নেই।

ড্রয়িংরুমের পাণ্ডুর আলোটা জ্বেলে দিল সে। চুপচাপ গিয়ে বসল সোফায়। সে কি অবচেতনে ভেবেছিল ললিত তার অপেক্ষায় বসে আছে বাড়িতে? রাগে ফুঁসছে? কিংবা কষ্ট পেয়ে গুম মেরে আছে?

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে ফোন করল ললিতকে। বেজে গেল ফোন। কেউ তুলল না। কোথায় গেল ললিত? বন্ধু-বান্ধবদের কাছে? পাবে? নাইট ক্লাবে? ও কি ড্রিঙ্ক করছে কোথাও বসে?

এই সময় হঠাৎ ভীষণ রকম মুচড়ে উঠল হোমীর বুক। সে ভয়ই পেল কেমন— ললিতকে এই প্রথম হারাবার ভয় হল তার। ললিতকে ভাল না-বাসলেও ললিতকে হারাবার ভয় তো হতে পারে তার— ভাবল সে!

হোমী আবার ফোন করল, আবার ফোন বেজে গেল।

আবার ফোন করল সে, আবার বেজে গেল ফোন।

তার জেদ চেপে গেল কেমন, সতেরো-আঠারো বার ফোন করল সে ললিতকে। ললিত, যে তার স্বামী, তার একমাত্র বন্ধু পৃথিবীতে, একদিন সে দাবি করেছিল তারা যেন দু'জনে প্রতি মুহূর্তে 'টাচ্'-এ থাকে পরস্পরের, আর ললিত তা মেনে নিয়েছিল, সেই ললিতকে ইথারে খুঁজতে লাগল হোমী পাগলের মতো। ললিত ফোন ধরেনি বলে একবার সে সোজা চলে গেছিল ললিতের অফিসে। ললিত তখন মিটিং-এ আর সে ললিতের চেম্বারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে! ফিরে এসে ললিত হতভম্ব, 'কী ব্যাপার? রাজ্যের লোক বলছে, তোর গার্লফ্রেন্ড কাঁদছে! কী হয়েছে?'

'তুই ফোন কেন ধরলি না?'

'আই ওয়াজ ইন মিটিং বেবি!'

'আমার মনে হল তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেছিস, তোকে আর কখনও দেখতে পাব না আমি!'

'তাই তুই কাঁদতে কাঁদতে চলে এলি? আচ্ছা পাগল তো? ঠিক আছে— ফোন না ধরতে পারার পজিশন হলে আই উইল লেট ইউ নো, অ্যাট লিস্ট আমি চেষ্টা করব তোকে জানিয়ে দিতে। কিন্তু এরকম প্যানিক করিস না।'

চেম্বারের কাচের দেওয়ালের ওপাশে তাকিয়ে দেখল ও, 'দ্যাখ সবাই ভাবছে কী না কী ব্যাপার!'

ললিত গাল টিপে দিয়েছিল তার, 'বাট, আই লাভড ইট! ফুলিশ গার্ল!'

সে উঠতে চেয়েছিল চোখের জল মুছে, ললিত বলেছিল, 'এখন কি তোকে ছাড়া যায়? চল্, অফিস কাটি!'

হোমী শেষবারের মতো চেষ্টা করল ললিতকে ধরার, আর তার সমস্ত কাড়ানাকাড়া থামিয়ে দিয়ে ফোন ধরল ললিত, 'হ্যাঁ বল!' ললিতের ভীষণ যেন তাড়া।

'তুই কোথায়?' কেমন বাধোবাধো ঠেকল প্রশ্নটা করতে হোমীর।

'নিউ আলিপুরে, মা'র কাছে!' এমন করে বলল ললিত, মনে হল ও নিজের জায়গায় ফিরে গেছে। এই যে হিন্দুস্তান পার্কের বারো হাজার টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট, এটার সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধই গড়ে ওঠেনি কোনও কালে। দুটো মানুষ দুটো জায়গা থেকে এসে একসঙ্গে বসবাস করলেই কি সেটা দু'জনের বাড়ি হয়ে যায়?

পুরো ব্যাপারটাকে হঠাৎ করে কেমন রুটলেস মনে হল হোমীর। সে বলল, 'কখন আসবি?'

'আজ ফিরছি না! সনুর জন্মদিন। পিসিরা এসেছে, রিঙ্কি এসেছে। লটস্ অফ পিপল! কাল এখান থেকে অফিসে চলে যাব।' সনু বা সনিয়া ললিতের দাদার মেয়ে।

সে বলল, 'এটা তুই ঠিক করলি না ললিত!'

ললিত থমকাল, 'ঠিক করলাম না? ও রিয়্যালি? ঠিক আছে খুকু, পরে কথা হবে। সবাই আমার জন্য ওয়েট করছে, আমরা খেতে বসেছিলাম!

ফোন ছেড়ে দিল ললিত। আর এই প্রথমবার তার মনে হল ললিত তাকে যেভাবে ট্রিট করেছে সে-ও ললিতকে সেইভাবেই ট্রিট করেছে দেড় বছর। আজ যেভাবে সে বলল ললিতকে, 'এটা ঠিক করিসনি।' এইভাবে তো সে কখনও কথা বলেনি ওর সঙ্গে? অবুঝ হয়েছে, দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা দেখিয়েছে কিন্তু আবেগের তো অভাব ঘটায়নি? সে সত্যি সত্যি শূন্য, রূঢ় হয়নি তাই ললিতও অনাদায়ী হয়নি কখনও। সে ভেবেছে ললিত ভীষণ কেয়ারিং, আসল ব্যাপারটা হল যে-ব্যবহারটা করেছে সে ললিতের সঙ্গে সেই ব্যবহারটাই ফেরত পেয়েছে শুধু। আর আজ একটা নিরেট প্রত্যাখ্যানেই বদলে গেছে চিত্রটা!

বিধি— বিবিধ

নিয়তিনির্দিষ্টভাবে ললিতের সঙ্গে প্রথমবার তার দেখা হয়েছিল অফিসের ল্যান্ডিং-এ। তখন শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। সেদিন ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে শহরে, বাইরে নামছে সন্ধ্যা, সারা আকাশ জুড়ে বাসায় ফেরত যেতে চাওয়া উন্মুখ পাখির দল। ল্যান্ডিং-এর বড় বড় কাচের জানলা দিয়ে সেই উত্তেজিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল হোমী। রুদ্রর সঙ্গে তখন ছাড়াছাড়ি হয়েছে তার বেশ কিছুদিন। সেই অবসরটুকু বেদনাহীন একাকিত্ব দিয়ে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করছে সে।

নীচে তাকালে তখন অফিস কম্পাউন্ডে সজোরে ঢুকে আসছে গাড়ির পর গাড়ি। আর তার থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসছে রিপোর্টাররা। ছ'টার খবর, সাতটার খেলার খবর, আটটার মেট্রো— বিকেল পাঁচটা মানে অফিসে ব্যস্ততার চূড়ান্ত। ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি, চিৎকার চেঁচামেচি। সে দেখল একজন বিখ্যাত ফুটবলার নামলেন গাড়ি থেকে। নিশ্চয়ই কোনও ডিসকাশনের গেস্ট হয়ে এসেছেন। তারপরই একজন অভিনেতাকে দেখল রোদচশমা খুলতে খুলতে উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে।

একটা সিগারেট খাবে বলে সিট ছেড়ে উঠেছিল হোমী। আর শীতে কাঁপছিল, কাঁপতে ভাল লাগছিল তার আসলে। নিজের গালে বারবার হাত ঘষছিল সে এমন এক ভঙ্গিতে যাতে বোঝা যায় সে একা, ভীষণ একা তখন! আর ললিত, হোমীদের কমিউনিকেশন কোম্পানির যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ঘটে থাকে যে-বৃহৎ ব্যাঙ্কিং সংস্থার মাধ্যমে, সেই সংস্থারই, একেবারে ইয়াং কিন্তু ভীষণ ডায়নামিক, সাকসেসফুল এক এগ্‌জিকিউটিভ ললিত বাসু, তখন অ্যাডমিন্-এর বিপুল মেহেতার সঙ্গে মিটিং সেরে দ্রুতপদে নেমে যাচ্ছিল সেই সিঁড়ি ধরেই যার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে সেটা না-টেনে অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে ছিল হোমী আকাশের দিকে।

সেদিন বিকেলে যদি হোমীকে ওইখানে, ওই অবস্থায় না-দেখত ললিত, যদি বিপুল মেহেতার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই গ্র্যানাইটের সিঁড়িগুলো পার হয়ে যেত, যদি না-তাঁকাত তার দিকে, আর তারপর আবার কখনও অফিসে এলেও যদি সেটা শীতকাল না-হত, যদি একটা হেকটিক দিন ঘাড় গুঁজে কম্পিউটারের সামনে কাটিয়ে ঠিক তখনই নিজের একাকিত্বকে জাহির করার জন্য নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে না-থাকত আকাশের দিকে, তা হলেও কি ললিতের মনে তৈরি হত কৌতূহল তার প্রতি? তা হলেও কি একটা এমন ছবির ছাপ পড়ে যেত ললিতের মনে যে, এর মাসখানেক পরে অফিসের বার্থ ডে পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে এসে তাকে দেখেই দৃশ্যটা ফেরত আসত ললিতের কাছে? ললিত হোমীকে সেই ভিড়ের মধ্যেও চোখের আড়াল হতে দিত না একবারের জন্যও? তারপর কখন কীভাবে যেন পরস্পরকে মুখোমুখি দেখল দু'জনে ডান্স ফ্লোরে। হোমীর খালি ওয়াইনের গ্লাস ললিতই পূর্ণ করে আনল। তারপর নেচে পরিশ্রান্ত হোমী দম নিতে গিয়ে বসল যে- টেবিলে সেখানেও ছিল ললিত, সেই টেবিলেই ছিল আরও কয়েকজন, ললিত তাদের সঙ্গে হইচই করছিল, সেই হুল্লোড়ে তাকেও টেনে নিল ও। পরের তিন ঘণ্টা ওখানে একসঙ্গেই কাটিয়েছিল তারা। একসঙ্গে

ডিনার খেয়েছিল। কিন্তু খালি পেটে রেড ওয়াইন খেয়েছিল বলে অম্বল হয়ে গেছিল হোমীর সেদিন। ডিনার খেতে খেতেই বমি পাচ্ছিল তার, দারুণ দারুণ সব ডেজার্ট— হোমী তাই খেতে চাইছিল বমি চেপে।

তার মনে আছে ললিত বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল তাকে, আর ভিক্টোরিয়ার উলটোদিকে গাড়ি থেকে নেমে বমি করেছিল হোমী অকাতরে! তখন মধ্যরাত।

তাকে ললিত নিজের রুমাল এগিয়ে দিয়েছিল, একটা থামস্-আপ কিনে খাইয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'একটু হাওয়া খেলে কেমন হয়?'

তারা সেদিন রাতভর চক্কর কেটেছিল ভিক্টোরিয়া, ময়দান, ফোর্ট উইলিয়ামের আশেপাশে। সে নিজের কথা বলেছিল, রুদ্রর কথা বলেছিল। ললিত বলেছিল পরমার কথা। এমবিএ ইন্স্টিটিউটে কাছাকাছি এসেছিল ও যে-মেয়েটির— সে-ই পরমা। এত ভাল ভাল গান শুনিয়েছিল ললিত ওর গাড়ির মিউজিক সিস্টেমে, তারপর বলেছিল, 'এখন আমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই, কিন্তু আই অ্যাম লুকিং ফর সাম ওয়ান!'

'কেমন মেয়ে পছন্দ তোমার?' জানতে চেয়েছিল হোমী।

'একটু ফানি! জীবন নিয়ে খুব সিরিয়াস মেয়ে আমার পছন্দ নয়। সবকিছু প্ল্যানমাফিক করে যে— না, শি'জ নট মাই কাপ অফ টি! আর তোমার কেমন ছেলে পছন্দ? নাকি তুমি রুদ্রকেই আবার ফিরে পেতে চাও?'

অঙ্গাঙ্গি কথার মধ্যে দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল নিজেদের যে পরস্পরকে তারা পছন্দ করতে শুরু করেছে। ভোরবেলা তখন সবে খুলেছে পিজি-র পাশের গুরুদ্বার সংলগ্ন চায়ের দোকানটা। বড় ভাঁড়ে চা খেয়েছিল হোমী আর ললিত। তারপর বেলভেডিয়ার রোডে নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেদিন বিকেলেই আবার দেখা হয়েছিল দু'জনের থিয়েটার রোডের কাফেতে। তারপর রোজ দেখা হতে থাকল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন, সারারাত ফোনে গল্প হতে থাকল। কী গুণাগুণ সেই সব গল্পের, কথার, কী হাতছানি দেখা করার, লং ড্রাইভে যাওয়ার, এসে গেল প্রেম, তার পশ্চাদানুসরণ করে সম্পর্ক। লোহা গলে যাওয়ার মতো তীব্র উত্তাপ ছিল সেই প্রেমে। অন্ধ উচ্ছ্বাস ছিল, আদি ও অকৃত্রিম কাতরতা ছিল শরীরের। গাড়িতে উঠেই কাচ তুলে দিয়ে, এসি অন করে চুমু, পারলে সারা শরীরে চুমু, সিট এলিয়ে দিয়ে উরুসন্ধিস্থলে ওষ্ঠ স্থাপন! শেষে একদিন ললিতের এক ব্যাচেলর বন্ধুর ফাঁকা ফ্ল্যাটে রক্তিম মিলন সম্পূর্ণ করল তারা। মিলিত অবস্থায় হঠাৎ বিছানা থেকে গড়িয়ে গেছিল দু'জনে মাটিতে, সশব্দে। অথচ ব্যথা লাগেনি। সে ললিতের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। যৌনতায় মাথারও একটা ভূমিকা আছে জানত হোমী। ললিতের মাথাটা ভারীই লেগেছিল তার। তাই ভাল লেগেছিল! ললিতের মাথার গড়নটা সুন্দর বলে কি স্বস্তি পেয়েছিল সে সেদিন!

আজ মধ্যরাতে অন্ধকার আবাসনে উদ্‌জাগরিত যে নিয়তিবাদ তাতে করে সে জানে এই প্রেম, এর পূর্বের সমস্ত প্রেম ছিল নিয়তি নিয়ন্ত্রিত। যাই হোক না কেন আজ পর্যন্ত ললিতের ভালবাসাকেই সে সবচেয়ে কম অবিশ্বাস করেছে। সে বুঝতে পারছে— ললিতকে ভুলতে তার সময় লাগবে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটার তা সর্বক্ষণ ঘটে চলেছে। তাকে আটকানো সম্ভব নয় কোনও উপায়ে— বলেছেন পামিস্ট ভদ্রলোক। সে টেরও পাচ্ছে যেন এমনি এমনিই ললিত ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তার। কেটে যাচ্ছে না, রক্তপাত হচ্ছে না, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে না হৃদয়ের মাংস— তবু ললিত দূরে সরে যাচ্ছে। একটা ময়াল, অতিকায়, বিকট— গিলে নিচ্ছে তাকে, ললিতকে নিয়তি হয়ে!

নিয়তি নির্মাণ

একটা ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সোমবার সারাদিন তার আর ললিতের মধ্যে কোনও কথাই হল না। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে হোমী নার্সিংহোম থেকে বেরোল ক'টা ওষুধের সন্ধানে। একটা অদ্ভুত র‍্যাশ বেরিয়েছে বাবার গায়ে, ফলে সমস্ত ওষুধই বদলে দিয়েছেন বাবার ভিজিটিং ডক্টর ডা. জালান। ওষুধগুলো কিনে সেগুলো সিস্টারের হাতে দিয়ে যখন বেরোল সে তখন রাত ন'টা।

হিন্দুস্তান পার্কে ফিরে সে বেল বাজায়নি। সে ভাবতেও চায়নি 'ললিত বাড়িতে আছে কি নেই'! দরজা খুলে দেখল বেডরুমে ল্যাম্প জ্বলছে, টিভি চলছে। সে ঘরে প্রবেশ করল। বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় মন দিয়ে ল্যাপটপে কিছু কাজ করছে ললিত। বেডসাইড টেবিলে একটা হুইস্কির পাঁইট, গ্লাসে অর্ধেকটা মতো ড্রিঙ্ক, প্লেটে ছড়ানো-ছিটনো পেঁয়াজ, টমেটো, কাসুন্দি। গুঁড়ো গুঁড়ো খাবারটা ফিশ ফ্রাই বা ওই জাতীয় কিছুর অবশিষ্টাংশ! মানে খাবার খাওয়া হয়ে গেছে।

সে ঘরে ঢুকল কিন্তু ললিত তাকাল না তার দিকে। একে একে পোশাক ছাড়ল হোমী। নগ্ন হল। তখন কোথা থেকে শুরু করা যায় কথোপকথন ভাবছিল সে। স্নান করার জন্য টয়লেটে ঢোকার আগে সে বলল, 'আমি ভাবলাম তুই আর ফিরবিই না এখানে!'

ললিত তাকাল মুখ তুলে, মুহূর্তের মধ্যে রেগে উঠল, 'ও! তুই এতটা ভেবে ফেলেছিস? খুকু, তোর প্রবলেমটা কী? হোয়াই কান্ট ইউ চেঞ্জ ইয়োরসেল্ফ আ লিটল?'

'কীরকম?' বলল হোমী।

'আমি তোর মধ্যে সব সময় তোর মাকে দেখি!'

'ললিত!' সেও রেগে উঠল।

'এগ্‌জ্যাক্টলি! কিন্তু আমি তোর বাবা এ জীবনে হব না, এটা তুই ভাল করে জেনে নে। আমাকে তুলবি আর আছাড় মারবি— হবে না সেটা! কী মনে করিস তুই নিজেকে? ইন্টেলেকচুয়াল পাগল হতে চাস তুই? প্রচুর দেখা আছে আমার— ও কে? আই টেল ইউ হোয়াট খুকু— এখন আমার মনে হয় লাভ'জ হেট্রেড! কেন বল তো? যখন তোর মতো কাউকে সব কিছুর বিনিময়ে ভালবাসে কেউ— তখন সে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তার নিজের ওপর আর শ্রদ্ধা থাকে না! সেল্ফ- রেসপেক্ট থাকে না। আমার এখন ঠিক তাই হচ্ছে, গড ড্যাম ইট!'

সে বলল, 'শোন, আমাকে তুই এত বোকা ভাবিস না। তোর প্রেমের গন্ধ কোনওদিনও ভাল লাগেনি আমার। সবসময় দয়ালু দয়ালু ভাব দেখিয়েছিস তুই। যেন অসুস্থ রোগীর সেবা করতে এসেছিস! পাগল বলছিস তুই আমাকে? তোর এত সাহস?'

'পাগল? তুই? কোনওদিনও হবি না! আর দয়ালু? তোদের কে দয়া করবে? তোরাই তো গোটা পৃথিবীকে দয়া করে বসে আছিস!'

‘তোরা! তোরা! তোরা!’ সে ঘুরে গিয়ে একটা চড় মারে ললিতের গালে।

ললিতের মুখচোখ তুমুল পালটে যায়। ও একটানে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে হোমীকে। নিজের পোশাক খোলে, চুলের মুঠি ধরে সরিয়ে দেয় তাকে ভেতরে, নিজের হাঁটু দিয়ে পা ফাঁক করে দেয় তার। এবং হোমী দেখে নিয়তি যে সত্যি কোনটা চায়, মিলন না বিচ্ছেদ, তা বোঝা যাচ্ছে না! কোনটা স্বয়ং ঘটমান, কোনটাই বা প্রয়াস? এই বিকৃত ধাঁধার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছে তাদের সম্পর্ক এখন। সে হাহাকার করে ওঠে, ‘আমাকে ছেড়ে দে ললিত! প্লিজ আমাকে ছেড়ে দে তুই! করিস না! এত অপমান করিস না! ছিঃ!’

ললিত সত্যিই ছেড়ে দেয় তাকে সঙ্গে সঙ্গে। অবান্তর ঝগড়া, দশ- বারো দিনের সহবাসহীনতা! ললিত টয়লেটে চলে যায়। সে পা গুটিয়ে পড়ে থাকে বিছানায়।

এর সাত কিংবা আট দিন পরে ঘুমন্ত হোমীকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করে ললিত, ‘খুকু, তুই বল, তুই কি কারও প্রেমে পড়েছিস? সত্যি কথা বল, নইলে আমি ঘুমোতে পারছি না!’

‘প্রেম, যৌনতা, বন্ধুত্ব— আমার এসবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে!’ বলে সে।

পর্যায়ক্রমে

মা বলল, 'শোন খুকু, আরতি আমাকে সিম্পলি ব্ল্যাকমেল করছে!'

বাবার ঘরে কবে শেষ ঢুকেছিল, হোমীর মনে পড়ল না। বোধহয় রেজিষ্ট্রি করে ফিরে সে ললিতের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার দরজায়। বাবা, একটু ঝুঁকে যাওয়া শরীর নিয়ে পাজামা তুলতে তুলতে এগিয়ে এসে বলেছিল, 'কী ব্যাপার?'

সেদিনও ঠিক একইভাবে বাবার ঘরে টাঙানো নোংরা মশারিটার দিকে চোখ পড়েছিল তার। বাবাকে সে বলেছিল, 'বাবা, এ ললিত আমরা বন্ধু ছিলাম। আজ থেকে স্বামী-স্ত্রী হলাম। আমরা রেজিষ্ট্রি করেছি একটু আগে, তোমাকে প্রণাম করতে এসেছি!'

বাবা দু'বার ঘাড় নেড়েছিল। ললিতের মুখের দিকে নয়, ললিতের পায়ের দিকে তাকিয়েছিল বাবা কোমরে দু'হাত রেখে, 'যাও, ভেতরে যাও!' বলেছিল বাবা।

রেল কোয়ার্টার থেকে একটা ধোপা ডেকে এনেছে হোমী। বাবার ঘরের বিশ বছরের পুরনো সব মশারি, বিছানার চাদর-টাদর, পরদা, টেবিলের ঢাকা, সব একে একে খুলে ফেলতে লাগল সে। পাশবালিশটার ঢাকনা খুলতেই মেঝে ভরতি হয়ে গেল ওয়ার ফেটে বেরিয়ে আসা তুলোয়।

মা তখনও বলে যাচ্ছে, 'তখন হাজার টাকা মাইনে শুনে তো লাফ দিয়ে ঢুকেছিল, তারপর বাড়তে বাড়তে দু'হাজার হল। এখন উনি আসছেন শুনে বলে কিনা তিন হাজার না-দিলে আমার পোষাবে না। শি ইজ আ বিচ, ইউ নো? এত পাজি মেয়েছেলে আমি খুব কম দেখেছি জীবনে।'

হোমী মাকে পাশ কাটিয়ে বেরোল বাবার ঘর থেকে। ডাইনিং রুমের কাচের বাসন রাখার বিশাল কাঠের শোকেসটার দুধারের কারুকার্য করা স্তম্ভগুলোর গায়ে হুক পোতা, এ-বাড়ির সব ধরনের চাবি ওই হুকগুলোয় ঝোলে। এক বছর বাদে হুকগুলোয় ঝুলে থাকা চাবিগুলোর মধ্যে সে তিনতলায় নিজের ঘরের চাবিটা খুঁজল। চাবি নিয়ে সে কতদিন পরে ঢুকল ঘরটায়। এক বছরের পুরনো চাপা বাসি গন্ধকে আমল না- দিয়ে খাটের নীচের ড্রয়ার টেনে খুলে বের করে আনল চাদর, বালিশের ওয়ার, বেডকভার। সব নিয়ে আবার তালা বন্ধ করে নেমে এল সে নীচে। বর্ষা যায়নি এখনও। প্রত্যেকটা জিনিসে সোঁদা গন্ধ। ঝেড়েঝড়ে তাই পেতে দিল সে বাবার ঘরে।

'তোমার কাছে ন্যাপথালিন আছে মা?'

'অনেক আছে খুকু,' বলেই মা আবার ফিরে গেল নিজের কথায়, 'একটা ডান্ডাওয়ালা মপ্ তুমি কিনে আনতে পারতে খুকু— ওটাই ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ!'

'আনব,' বলল সে।

চাদর-টারগুলো সব গুনেগেঁথে নিয়ে গেল ধোপাটা, 'ইয়ে ক্যয়া ধোয়েগা? ধোনেসেই ফাট জায়গা!' বলে গেল।

প্রায় দেড় মাস পরে আজ বাবাকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে নার্সিংহোম থেকে। ডক্টর অশোক জালান তাকে ডেকে বললেন, 'দেখো বেটা, ইয়োর ফাদার হ্যাজ লিভড্ হিজ লাইফ অ্যান্ড হি'জ নট গোয়িং টু গেট এ সেকেন্ড চান্স। এখন যতদিন নিশ্বাসটা নিতে পারেন— ব্যস! উনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না, সো নো পয়েন্ট ইন কিপিং হিম হিয়ার। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাও!'

মা'র আপত্তির কিছু ছিল না। আয়া সেন্টার থেকে দু'বেলা দুটো আয়া, দু'বেলা দু'জন নার্স, সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার-টিলিন্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থা সবই করেছে হোমী। ডক্টর জালান বলেছেন, বেডসোর যাতে না-হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কিন্তু কে না জানে শুধু চোখের পাতা খোলা আর বন্ধ করা ছাড়া যে মানুষ শরীরের একটা পেশির নাড়ানোর কথা বিস্মৃত হয়েছে, তার বেডসোর হবেই। ঘা, পোকা, রক্ত, পুঁজ, দুর্গন্ধ— অবশেষে মৃত্যু!

এই একটা বিষয়ে মা অদ্ভুত শান্ত, কোনও দুশ্চিন্তা নেই, কোনও উদ্‌বেগ নেই। এ নিয়ে একটা বাক্যও উচ্চারণ করছে না মা। তার ঘর গোছানো হয়ে এসেছে যখন, তখন মা তাকে ডাকছে চা খেতে, বলছে, 'খুকু, তুমি কি লাঞ্চ খাবে?'

চায়ে চুমুক দিচ্ছে হোমী, 'না, আমি অফিসে ফিরে যাব। ঠিক চারটের সময় যাব নার্সিংহোমে!'

মা চেয়ার টেনে বসছে তার মুখোমুখি, আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে, 'ফ্রিজটা এবার বদলাতে হত খুকু। এত পুরনো জিনিসে আর চলে না। শুধুই বরফ জমে যায়। ফ্রিজারে এত বরফ জমেছে যে, ভেতরে কী আছে বুঝতেই পারছি না। তিন-চারদিন আগে আরতি একটু মাছ এনে দিয়েছিল, সেটা খেয়েছি কিনা মনে নেই। তবে আরতিকে দিয়ে মাছ কেন, কিছুই আর আনাচ্ছি না বাবা! কী ঠকান ঠকায়, বলে কিনা দেড়শো টাকার মাছ? চোর! চোর! ফাঁক করে দেবে চুরি করে। অন্য কাউকে না হলেই নয়। বেশ মজা পেয়ে গেছে! আর খুকু, ফ্রিজটা... দেখেশুনে নতুন একটা ফ্রিজ এনে দাও আমাকে। অলিও ভীষণ রাগ করছিল, বলছিল, ফ্রিজ বদলাও, টিভি বদলাও, এসি বদলাও! এমনকী এ-বাড়ির ডোরবেলটার শব্দটাও নাকি ওর পছন্দ নয়! তখন আমি বললাম, তুমি করে দিয়ে যাও যা করার। বাড়ি তো তোমারও। তা ছাড়া ঘাড়ে যে- বোঝাটা ছিল, সেটাও তো নেমে গেল তোমার। এবার মা'র জন্য কিছু করো! তারপর আর সাড়াশব্দ নেই অলির। অমনি চোখে জল, কি না ছেলেমেয়েদের জন্য মন কেমন করছে!

হোমী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'মা, এবার আমি উঠি। চারটে নাগাদ নার্স আসবে, নাম সুলেখা...! সব দেখিয়ে দিয়ো!'

মা শুনলই না, 'একটু ইলিশ মাছ রেঁধেছিলাম, তাই খেতে গিয়ে অমনি ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। কী? না ওরা সারা জীবনই হস্টেল থাকল, বড় হয়ে ছেলে চলে গেল ইউএসএ, মেয়ে ইটালি, কোনওদিনও ছেলেমেয়েকে ভাল করে খাওয়াতে পারলাম না, অনিরুদ্ধ ইলিশ ভীষণ ভালবাসে...! অলি তখন এইসব আদিখ্যেতা করতে লাগল! ছোট থেকে কোলছাড়া করে মানুষ করলি তোরা, স্বাধীন থাকবি বলে, এখন ছেলেমেয়ের জন্য দুঃখ উথলে উঠছে! তা যাই হোক, ছেলেমেয়ের কথা তবু মনে পড়ে— মা'র জন্য ভাবতে হলেই তখন এই সুবিধে নেই, ওই সময় নেই। অবশ্য, মিথ্যে বলব না, জুতোটা কিনে দিয়ে গেছে এবার! তা কিনে দিয়েই কী বলল জানো?' মা হাঁপাচ্ছে, 'বাড়িটা এবার প্রমোটারকে দিয়ে দাও মা, এত বড় বাড়ি রেখে কী লাভ, একটা থ্রি বেডরুম ফ্ল্যাট নিয়ে নাও!' আমিও মুখের ওপর বলে দিয়েছি খুকু, ওইটে হচ্ছে

না! আমি এ-বাড়িতে জন্মেছি, এ বাড়িতেই মরব! বলল, 'না, আমি তোমার ভালর জন্য বলছি!' আমিও বলে দিয়েছি, আমার ভাল তোমাকে ভাবতে হবে না অলি। তুমি নিজের ভাল ভাবো! তখন জানো তো খুকু, অলি খুব রেগে গেল— 'স্টপ ইট মা! স্টপ ইট! তোমার মনে ভীষণ প্যাঁচ, তুমি কোনও কথা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারো না!' আচ্ছা খুকু, তুমিই বলো— এই বয়সে আমার পক্ষে ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকা সম্ভব? তোমরা তো কেউ খবর রাখো না— ট্যাঙ্কে কাক মরেছিল, কী কষ্ট করে লোক ডেকে পরিষ্কার করালাম। পারি না, তবু করছি! যখন পারব না, তোমার বাবার মতো অথর্ব হয়ে যাব তখন তোমরা যা পারবে করবে! কিংবা টান মেরে ফেলে দেবে!

সে অনেকদিন পরে আলতো করে জড়িয়ে ধরল মাকে, 'এত চিন্তা কোরো না মা, ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও!'

'তোমরা আবার ভাগ্য-টাগ্য মানো নাকি খুকু?'

সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে যখন, মা বলল, 'আমাকে ডেন্টিস্টের কাছে কবে নিয়ে যাবে বলো তো! মুখের এপাশ দিয়ে তো কিছু খেতেই পারছি না! ডালমুট, বাদাম ধরে সব আরতিকে দিয়ে দিলাম। বাসি হয়ে যাচ্ছিল। ওরই লাভ!'

বাড়ির সামনে থেকেই ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছে সে, ডেকে দাঁড় করিয়েছে একটা ট্যাক্সি— তার আগেই একটা তার বয়সি মেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে উঠে বসে পড়ল। সে বলে উঠল, 'একী, আমি ডেকেছি!' এবং সে চিনতে পারল মেয়েটাকে— বনি! রুদ্রর ক্লাসমেট ছিল। তার সঙ্গেও আলাপ ছিল যথেষ্ট।

বনিও চিনতে পেরেছে তাকে, 'আরে হোমী না?'

সে হাসল।

'আরে আরে, উঠে এসো,' বলল বনি।

কাঁধ ঝাঁকাল হোমী, 'বনি, আমি এ জে সি বোস যাব!'

'সেম রুট হোমী, আমি যাব নাইটিংগেলে!'

সে উঠে বসল ট্যাক্সিতে। বুঝল বনি আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে তাকে।

'তারপর কী খবর?' জানতে চাইল বনি।

'ঠিকই আছে! তুমি?'

'আমি তো এমডি করছি! এ বছরই ঢুকেছি! রুদ্র এমএস করছে জানো তো?'

'না, আমি জানি না, আর জানার কথাও না বনি!'

চিড়িয়াখানার সামনে বিরাট ট্র্যাফিক। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। যত বেশি রেড সিগনাল তত বেশি কথা!

বনি বলল, 'রুদ্র তোমাকে দারুণ ভালবাসত। বাট নাউ হি'জ সো জাজমেন্টাল অ্যাবাউট ইউ!'

বনির বলার মধ্যেই ছিল পুরো খেলাটা। হোমীকে প্রশ্ন করতেই হল, 'কীরকম!'

'এই সেদিনই তোমার কথা হচ্ছিল। আমিই তুলেছিলাম আসলে। সাম টাইম ইউ ফিল নস্টালজিক আউট অফ নাথিং। সেই আমাদের আড্ডা দেওয়া, হইচই, তোমাদের প্রেম! রুদ্রদের বাড়ির ছাদে পিকনিক অ্যান্ড অল। তুমি আর রুদ্র তো তখন রক্তের স্বাদ পেয়েছ আর আমি খালি ব্রণ খুঁটছি! তো এইসব প্রসঙ্গ উঠেছিল, হঠাৎ রুদ্র অদ্ভুত খারাপ মন্তব্য করল তোমার সম্পর্কে!

‘রিয়েলি?’ সেদিন তাদের প্রেমপর্ব যত কষ্ট দিয়েছে বনিকে, বনি আজ তার প্রতিশোধ তুলতে চাইছে নাকি?

‘রুদ্র কী বলল জানো— বলল, তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ায় ও দুঃখ পেয়েছিল খুব, অ্যাট ওয়ান টাইম হি থট অফ কমিটিং সুইসাইড, কিন্তু ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারে তুমি ওকে ছেড়ে যাওয়াটা ওর পক্ষে কতখানি উপকারের হয়েছে! ওর বক্তব্য, তুমি নাকি ওর কেরিয়ার নষ্ট করে দিচ্ছিলে! ওর পড়াশোনার ফোকাস নষ্ট হয়ে গেছিল। তুমি ওকে ক্লাস করতে দিতে না! এস ও পি ডি-তে গিয়ে বসে থাকতে। টেনে টেনে নিয়ে যেতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব অন্ধকার গাছতলায়! তুমি ওকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিলে যে, ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। ও বুঝতে পারছিল শুধু তোমার রূপের জন্য ও পাগল হয়ে আছে নইলে তোমার মনটাকে ভালবাসার কোনও নাকি কারণই ছিল না। ও নাকি তোমার মতো আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে জীবনে দেখেনি!

‘আর?’

‘আর... আর তুমি ওকে সবসময় একা পেতে চাইতে! ওর সব বন্ধু- বান্ধবদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতে! আমি আর তুমি, তুমি আর আমি— রাতদিন শুধু এই! ইউ আর কোয়াইট আ বোর— বলেছে রুদ্র! সিক!

পিজি হসপিটাল পার হচ্ছে ট্যাক্সিটা। হোমী বলল, ‘এভারলাস্টিং রিলেশন কারওই হয় না জীবনে বনি। সম্পর্ক কোনও না কোনও কারণে ভাঙেই। আমাদের ক্ষেত্রে এসবই কারণ ছিল। ওয়েল, আমার নিশ্চয়ই এগুলো শুনে আনন্দ হচ্ছে না তবে এটা ঠিক যে, আই অ্যাম আ বিট লাইক দ্যাট!’

ওয়ান ওয়ে টোয়ান ওয়ের গল্প আছে, সে টুক করে নেমে পড়ল এক্সাইডে। অন্য ট্যাক্সি ধরল।

অফিসে ঢোকার মুখে গৌরীর সঙ্গে দেখা হল হোমীর। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। পিছনে ক্যামেরাম্যান রিচার্ড! শ্যুটে গেছিল নিশ্চয়ই! গৌরীর চোখেমুখে একটা উত্তেজনা। ভাল স্টোরি পেলে যেমনটা হয় সাংবাদিকদের তেমনটাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হোমী বলল, ‘কী স্টোরি রে?’

‘ব্যাপক স্টোরি হোমী। মিনা নামে একটা মেয়ের হাজব্যান্ড মারা গেছে ডায়রিয়ায়, এই দিন তিনেক আগে মাত্র মারা গেছে। এদিকে মিনা ছ’মাসের প্রেগন্যান্ট। মেয়েটি ঠিক করেছে স্বামী নেই যখন তখন এই বাচ্চা আর সে রাখবে না। অ্যাবরশন করাবে। এদিকে ছ’ মাসে অ্যাবরশন অসম্ভব...।’

তারা নিউজরুমে ঢুকে পড়েছিল। যশ এগিয়ে এল গৌরীকে দেখে, ‘ক্যায়সা রহা?’

‘প্যাথেটিক, যশ!’ বলল গৌরী।

‘তাড়াতাড়ি এডিট করে ফেলে দাও।’

ফেলে দাও মানে এয়ার করে দাও নিউজটা!’

যশ চলে যেতে হোমী বলল, ‘তারপর?’

গৌরীর তাড়া রয়েছে, ‘তারপর আর কী, ডাক্তাররা যতই বোঝায় সে হাত-পা ধরে কান্নাকাটি করে, বাচ্চা সে রাখবে না, অপারেশন করে বের করে দেবে। ডাক্তার বলছে, এটা হত্যা, এটা অপরাধ, তোমাকে পুলিশ ধরবে, আমাকে পুলিশ ধরবে! তাকে কে বোঝায়, কেন অপরাধ হবে? পেটের বাচ্চা তো মেরে ফেলা হয়েই থাকে!

গৌরী চলে গেল নিজের সিটে। হোমী ভাবছিল বিষয়টা নিয়ে। একটু পরে সে যশকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল কনফারেন্স রুমে। যশ তাকে দেখে বলল, 'তোমার সিঙ্গল মাদারের স্টোরিটা কমপ্লিট হোমী?'

সে বলল, 'না, আজকালের মধ্যে হয়ে যাবে। তবে কাল থেকে প্রোমো যাচ্ছে! তুমি দেখোনি যশ?'

যশ দেখেছে।

যশ বলল, 'স্টোরিটায় একটু বেশি করে সেই সব সেলিব্রিটিদের বাইট ঢোকাও হোমী, যারা সিঙ্গল মাদার! স্টোরিটার মধ্যে যেন একটা টাফ ব্যাপার থাকে! একা হাতে বাচ্চা মানুষ করাটা তো একটা বড় লড়াই!'

'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা আর খুব চ্যালেঞ্জিং আছে যশ! সমাজে এখন প্রচুর সিঙ্গল মাদার! আর তারা খুব এফেক্টিভলি কেরিয়ার সামলেও বাচ্চাকে বড় করছে— !'

'তার মানে তুমি বলছ, যত রকম হার্ডশিপের কথা শোনা যেত সিঙ্গল পেরেন্টের জীবনে, সেসব এখন আর নেই?'

'তুমি স্টোরিটা দেখো, ইন্টারভিউগুলো দেখো, সবাই শুধু একটাই কথা বলছে যশ, টাইম-ম্যানেজমেন্ট! একটা নিট অ্যান্ড ক্লিন রুটিন ইজ হোয়াট দে সেটল ফর!'

'সোসাইটি বদলাচ্ছে! গুড, এইসব নতুন নতুন তথ্যই তো চাই, কিপ ইট আপ। তোমার টিম তো বেশ ভাল কাজ করছে!'

'সব্বাই!' আমি একটা কথা ভাবছিলাম যশ। অ্যাবরশন ব্যাপারটা কোন পর্যায় অবধি আইনি, কোন পর্যায়ের পরে সেটা বেআইনি? হত্যা? মানুষ মারার মতো অপরাধ? কোন স্টেজের পর থেকে একটা ভ্রূণ মানুষ হওয়ার সম্মান পেতে শুরু করে? গৌরীর স্টোরিটার প্রেক্ষাপটে উঠে আসে না কি এরকম ক'টা প্রশ্ন?'

যশ ভাবল কিছু, 'পৃথাকে ডাকো তো হোমী!'

পৃথা এল, কিছুক্ষণেই মধ্যেই রাত ন'টার স্লটে এই নিয়ে একটা প্যানেল ডিসকাশন অ্যারেঞ্জ করে ফেলল পৃথা। সে তখনও ভাবছিল, যশ বলল, 'তুমি আরও কী ভাবছ হোমী?'

'আমি ভাবছি— এটা যেমন একটা দিক, আর একটা দিক হচ্ছে, আমার শরীর, সেই শরীরে আমি একটা কিছু বহন করছি। কিন্তু বহন করব কি করব না এ বিষয়ে আমার, একজন স্বাধীন হিউম্যান বিয়িং হিসেবে আমার অধিকার কত দূর? আমি চাইলে রাখতে পারি যেমন, না-রাখতে পারাটাও চাইতে পারি না কেন?

যশ তার ভেতর অবধি পড়ে ফেলতে চাইছিল, 'তুমি বলতে চাইছ মিনা নামের মেয়েটার এ বিষয়ে কী অধিকার আছে?'

'নিজের প্রতি কী অধিকার আছে মানুষের অ্যাকচুয়ালি? নিজের শরীর এবং নিজের মনের প্রতি কি অধিকার আছে সত্যি সত্যি আমাদের? এবং ঠিক কোন জায়গা থেকে আমার শরীর, আমার মন— রাষ্ট্রের দ্বারা অধিকৃত হয়ে যায়? রাষ্ট্র বা সমাজ সিদ্ধান্ত নেয় আমার শরীর, আমার মন নিয়ে? আমি কী করতে পারব, কী করতে পারব না, এই নিয়ে?'

পৃথা বলল, 'টু কমপ্লিকেটেড হোমী! খুব বেশি সূক্ষ্ম!'

যশ বলল, 'হোমী, এরকম একটা বিষয় নিয়ে আমরা পরে কখনো কাজ করব কেমন?' বলে এমন একটা মুখভঙ্গি করল যেন ও বুঝেছে হোমীর আবেগটা এবং সময় এলেই ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে।

সময় হয়ে গেছিল। সে আবার বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। তখন প্রায় ছ'টা বাজে। বাবাকে সে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাড়ি সেটা ললিতকে সে বলেইনি। যা করতে হবে সব একা হাতেই করতে হবে তাকে! বেশ কিছুদিন হল তাই করতে হচ্ছে! ললিত আর সে এখন পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। দু'বেলাই দু'জনে তারা আলাদা আলাদাভাবে বাইরে খায়। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে একই বিছানায় কিন্তু সে তো দূরপাল্লার ট্রেনেও কত হাতের কাছে, প্রায় পাশাপাশিই শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে কত মানুষ! কিন্তু তবু তারা কি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে?

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ যখন বাবাকে সেট করে দিয়ে বেলভেডিয়ার রোডের বাড়ি থেকে বেরোল হোমী তখন সে ভাবল, তাকে কি ফিরতেই হবে হিন্দুস্তান পার্কে? বেরিয়ে আসার সময় মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল তাকে, 'কী ব্যাপার, সব একা একাই করছ খুকু? ললিতকে ধারে-কাছে দেখছি না? ঘনঘন ফোন নেই— এনিথিং রং?'

সে উত্তরে বলল, 'ইটস্ নট ওয়ার্কিং মা, এখনও কোনও কথা হয়নি ললিতের সঙ্গে তবে খুব শিগগিরি একটা ডিসিশন নিতে হতে পারে।'

মা ভুরু তুলে দেখেছিল তাকে, বলেছিল, 'এত তাড়াতাড়ি? তা তোমার ঘরটা পরিষ্কার করাব? গদিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে!'

সে বলতে যাচ্ছিল, 'দরকার হলে আমি করিয়ে নেব।'

কিন্তু আসলে বলল, 'না!'

বাড়ি ফিরে সে দেখল সমস্ত ফ্ল্যাটটা লন্ডভন্ড। চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটানো ললিতের জামাকাপড়, বইপত্র, ফাইল কাগজ, জুতো, এটা-সেটা! এবং জিনিসগুলোর মধ্যে তার জিনিস কিছু নেই— শুধু বিছানার ওপর এক দিকে ডাঁই করা রয়েছে হোমীর চেন দেওয়া শাড়ির প্যাকেটগুলো আর উলের পোশাক। যেন ললিত তার দামি শাড়িগুলো বের করতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই কিন্তু এলোমেলো করে ফেলতে চায়নি কিছুতেই! সে বেডরুমে গিয়ে দাঁড়াতেই ললিত হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে বিছানার ওপর, ললিতের চোখ দুটো ঝকঝক করছিল এমন যেন সদ্য মেজে এসেছে। মুখের ওপর লেগে ছিল না রাগ, অস্বস্তি, বিদ্বেষ কিংবা অসফল কামনা কোনও। বালিশের নীচ থেকে একটা স্ট্যাম্প পেপার ডিড বের করল ললিত, 'খুকু, এটা এ ফ্ল্যাটের ডিডটা, ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, এটা তোর নামে ট্রান্সফার করে দেবেন উনি। ভাড়া-টাড়া সব একই থাকছে। আর যদি তুই এক্ষুনি ট্রান্সফার নাও করাতে চাস, প্রবলেম নেই কারণ এগ্রিমেন্ট পিরিয়ড শেষ হতে এখনও এক বছরের ওপর!'

'তুই কি চলে যাচ্ছিস ললিত?'

'আমাকে যেতেই হচ্ছে খুকু!'

'কোথায়?'

'তুই তো জানিস অফিস আমাকে বারবার বাঙ্গালোর পাঠাতে চাইছিল, আমিই যাওয়াটা আটকে রেখেছিলাম কোনওমতে, সেটাও তোরই জন্য। কিন্তু যে মেয়ের জীবনে প্রেম, যৌনতা, বন্ধুত্ব— এইসব কিছুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তার সঙ্গে থাকাটা ভীষণ অসম্মানজনক, অমর্যাদাকর। আফটার অল আমি একজন পুরুষ মানুষ। আমি তোকে পজেস করি না ঠিকই কিন্তু দেয়ার আর সার্টেন রিক্যোয়ারমেন্টস! সম্পর্কের কাছে আমার অনেক দাবি রে। আমাকে যদি তুই তোর বাবা ভেবে থাকিস তা হলে ভুল করবি।

প্লিজ, কিছু মনে করিস না, নিজেকে সবাই ভালবাসে কিন্তু এতটা ভালবাসা ভাল নয়। সত্যি বলছি, তোর চোখ দুটো কেমন বদলে গেছে যেন। এই সেদিনও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তোর কান্নার শব্দে, উঠে গিয়ে দেখি তুই বারান্দায় বসে ফুঁপিয়ে যাচ্ছিস! আকাশে কী বিরাট একটা চাঁদ ছিল সে রাতে, পূর্ণিমা নিশ্চয়ই! তুই সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিলিস, কী সব বলছিলিস। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তোকে ডাকলাম। তুই তাকালি কিন্তু চিনতে পারলি না আমাকে। তোর সেদিনের চোখ দুটো খুকু— ইউ সিমড লুনাটিক!'

ললিত থামল, ফের বলল, 'আমি তোকে সামলাতে পারব না খুকু। তোর আত্মপ্রেমেই ধ্বংস হয়ে যাবি একদিন!'

হোমী ভাবল বলে, 'তুই ঠিক বলেছিস ললিত—একেই সেই পামিস্ট জন্মমুহূর্তের প্রেম বলেছিল! আমি বুঝতে পারিনি।'

কিন্তু সে বলল, 'আমি এই ফ্ল্যাট রেখে কী করব ললিত, আই কান্ট অ্যাফোর্ড দিস! চব্বিশ হাজার থেকে বারো হাজার চলে গেলে কী থাকবে আমার?'

'বেলভেডিয়ার রোডে ফিরে যাবি?'

'না, তা যাব না!'

'তা হলে বাড়িটা তুই রাখ, আই উইল পে!'

'কেন? তুই কেন দিবি?'

ললিত হোমীর দু'গাল চেপে ধরল দু'হাতে, 'কারণ আমিই পালাচ্ছি!' এই কথায় হো হো করে হেসে উঠল হোমী, বলল, 'বোকা কোথাকার!'

ললিত কলকাতা ছাড়ার প্রায় দিন কুড়ি পরে— যেদিন সে শিফট করবে বলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সব গোছগাছ করছে, সেদিনই দুপুরে ডাকে এল চিঠিটা। কেয়ারটেকার ছেলেটা দিয়ে গেল। ললিত একটা মিউচুয়াল ডিভোর্সের ড্রাফট্ করে পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি—

'খুকু, তুই সংশয়বাদী! তুই খুব ফিলজফিকাল! আমি তোকে রেসপেক্ট করি— কিন্তু তুই যেভাবে জীবন নিয়ে, নিজের এবং অন্যের জীবন নিয়ে উদাসীন থাকতে পারিস, আমি তা পারি না। আমার মধ্যে যতই হোক, একটা শিকড় আছে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে। তাই তোকে বেশি সময় আমি দিতে পারছি না! বিবেচনা যা করার, একটু তাড়াতাড়ি করিস!

ইফ নট এনিথিং এলস্— আই মিস ইয়োর ফ্রেন্ডশিপ! লাভ— ললিত।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে হোমী প্রেমের জায়গাগুলো, বন্ধুত্বের জায়গাগুলো, শরীরের জায়গাগুলো প্রত্যেকটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়ার বদলে সে শুধু দেখল ঘটনাটা ঘটে গেছে! এবং পুরোপুরি!

কাল এবং নিয়তির দূত

কাল নিয়ন্ত্রিত ঘটনাপ্রবাহের প্রতি হোমী যে নির্ভরশীল হয়ে উঠছিল অন্তঃকরণে, তাই শুধু নয়— সেই সঙ্গে চূড়ান্ত অদলবদল ঘটে যাচ্ছিল তার বহির্জীবনেও। সে হিন্দুস্তান পার্ক ছেড়ে গড়িয়াহাটের মোড়ের একটা বেশ পুরনো বাড়িতে উঠে এল। বাড়িটার একতলাটায় বিখ্যাত শাড়ির দোকান ছাড়াও রয়েছে একটা গয়নার দোকান আর একটা কাচ আর স্টিলের বাসনের দোকান। কোনওমতে দাঁড়িয়ে আছে একটা পান, সিগারেট, কোল্ড ড্রিঙ্কের দোকানও। বাড়িটার দোতলাটার একটা অংশে চলে মেয়েদের মেস। আসলে বাড়ির শরিকি মালিকদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোল হওয়ায় কোনও তরফ নিজেদের দখলে থাকা অংশটা মেস-এ রূপান্তরিত করে দিয়েছে। ঢুকেই একটা ছোট ডাইনিং স্পেস। ডান হাতের প্রথম ঘরটা কমন বসার ঘর। এ ছাড়া বড় বড় আরও দুটো অ্যাটাচড্ বাথওলা ঘর। এক একটায় চারটে করে সিট। তারপরও ইচ্ছে করলে ঘুরে ঘুরে নাচার অনেক জায়গা পাওয়া যাবে।

বাড়িটা হোমীর খুব পছন্দ হয়ে গেল। কত উঁচু সিলিং, কড়িবড়গা, মিহি মোজাইক করা ফ্লোর, মোটা মোটা দেওয়াল। পায়ের পাতা অবধি লম্বা লম্বা খড়খড়ি দেওয়া জানলা। টানা লম্বা বারান্দাটা ঝুলে আছে গড়িয়াহাটের ফুটপাতের ওপর। তার নীচেই হাজারো পসরা, হাজার-একটা মানুষের সশব্দ বিচরণ। ঠিক নাকের ডগায় বিকেল থেকে সারারাত জ্বলছে নিয়নের বিজ্ঞাপন। রাতে ঘরের সব আলো নিভে গেলে প্রত্যেকটা বিছানায় ঘুমন্ত মেয়েদের শরীরের ওপর জ্বলতে- নিভতে থাকে সেই নিয়নের আলোর কিয়দংশ! মনে হয় মেয়েরা নয়, ঘুমিয়ে আছে পরির দল। হোমীর বিছানায় এসে পড়ে লাল আলো। সেই লাল আলোর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চেনা পরিচিত কেউ যে তার এই ঠিকানাটা জানে না, এই ভেবে কেমন এক রোমাঞ্চে ভরে ওঠে হোমীর শরীর। মনে হয়, যে সে কোথাও বিলং করে না। হাতের সরু সরু রেখা ছেড়ে কীভাবে সত্যি হয়ে উঠছে তা।

শিফট করার সময় দিন সাতেক ছুটি নিয়েছিল সে অফিস থেকে। ভোর থেকে হুড়োহুড়ি, সাড়ে ন'টা-দশটা বাজলেই মেস ফাঁকা। এর পর থেকে বিকেল গড়ানো অবধি নতুন জায়গায় হোমী একা হয়ে যায়। শুয়ে শুয়েই কাটায় সে দুপুরটা। বই পড়ে কিংবা এঘর-ওঘর ঘোরে, টানা লম্বা বারান্দাটায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না কারণ এত বহু রকমের ইলেকট্রিক ফোন কেব্‌লের তার গেছে বারান্দাটা দিয়ে, যে দাঁড়ালে দাঁড়াতে হয় কাঠের পুতুলের মতো। তারপর সন্ধে নামার আগে থেকেই বারান্দায় লাগানো বিজ্ঞাপনের আলোগুলো জ্বলে ওঠে। তখন তো বারান্দায় যাওয়াই যায় না আর।

একটা পুরনো কার্পেট, ছেঁড়া সোফা আর একটা রেডিওগ্রাম দিয়ে সাজানো মেসের ড্রয়িংরুম। তবু সেখানেই মাঝে মাঝে মেসের বোর্ডারদের গেস্টরা আসে। একটা কাঠের টুলের ওপর চা দেওয়া হয় তাদের।

মেয়েগুলোকে ভাল করে লক্ষ করে দেখে হোমী। প্রত্যেকেই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর্থিক অবস্থা সকলেরই বেশ ভাল। এই মেসে থাকার মাথাপিছু খরচ চার হাজার। একটা রান্নার লোক আর একটা অন্যান্য

কাজের লোক আছে। দু'হাজার সিট ভাড়া হিসেবে দিয়ে দিতে হয় বাড়ির মালিকদের। বাকি দু'হাজার টাকা একটা ফান্ডে জমা করতে হয় মাসের প্রথম তারিখে। খাওয়ার খরচ, গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল, কাজের লোকের মাইনে এবং ফ্ল্যাট পরিচ্ছন্ন রাখার খরচ ওঠে ওই টাকা থেকে। বোর্ডাররাই ঘুরে ঘুরে দায়িত্ব পায় এদিকগুলো দেখাশোনার।

কেউ এখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কেউ নামী অভিনেত্রীর ট্রুপে নাচে আর দেশ-বিদেশ ঘোরে, কেউ বিদেশি কসমেটিক কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে একা হাতে ব্যাবসা চালাচ্ছে। পাশের রুমের রত্নাবলী কাছেই একটা কলেজের অধ্যাপিকা। শর্মিলা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, হসপিটালে চাকরি করে। খুশি মেয়েটা উঠতি মডেল। এদের মধ্যে কেউ বিবাহিতা, কেউ ডিভোর্সি। খুশির বয়ফ্রেন্ড আছে। রাত দুটো-আড়াইটে অবধি খুশি নিশ্বাসের শব্দে তার সঙ্গে কথা বলে।

এখানে যারা বোর্ডার সেরকম মেয়েদের হোমী কখনও কাছ থেকে দেখেনি। এরা প্রত্যেকেই খুব সাধারণ। ভদ্র সভ্য, মধ্যবিত্ত। অর্থ রোজগার ও অর্থ ব্যয়, এই দুটো বিষয় ভীষণভাবে প্রাধান্য পায় এদের কাছে। হঠাৎ হঠাৎ এরা মেতে ওঠে খুব— তখন চিকেন আনানো হয়। কেউ সেটা কষে রান্না করে। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত দিয়ে মেখে, হাঁটুর ওপর ম্যাক্সি তুলে বিছানায় বসে হইহই করে খাওয়া হয়। পরের দিন আবার ভোর না-হতেই কাজেকর্মে বেরিয়ে পড়ে এরা। এদের মধ্যে বেশি উচ্ছল প্রকৃতির মেয়ে খুশি, অনেক কথা বলে। ব্রা এবং প্যান্টি কিনে আনলেও সবাইকে দেখায়। প্রথম দিন খুশি তাকে বলেছিল, 'একজন সাংবাদিকেরই যা অভাব ছিল এখানে!'

দ্বিতীয় দিন খুশি তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো হোমীদি? শুয়েই আছ? ডিপ্রেশন?'

সে বুঝিয়ে বলেছিল ব্যাপারটা— 'কটা দিন রেস্ট নেব। শুধু শুয়ে থাকব।'

খুশির কথা চট করে শেষ হতে চায় না, তা ছাড়া তার সম্পর্কে তথ্যগুলো সংগ্রহ করার কাজে ওকেই তো সবাই ফিট করেছে।

'এর আগে কোথায় থাকতে তুমি?' খুশির প্রশ্ন। তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে বিনা অনুমতিতে সিগারেট বের করে নিল মেয়েটা।

'হিন্দুস্তান পার্কে!'

'ও, কাছেই। কেমন ছিল মেসটা? নাকি পেয়িং গেস্ট?'

'ভাল ছিল, মজার ছিল!'

'তোমার বাড়ি কোথায় এমনিতে?'

এই প্রশ্নটার কোনও জবাব আদতে জানাই ছিল না হোমীর। সে খুশির দিকে তাকিয়েছিল নীরবে। খুশি কী ভাবল কে জানে, 'দাঁড়াও, শর্মিলাদি ডাকছে কেন শুনে আসি!' বলে দ্রুত নেমে চলে গেল।

এইভাবে সারাটা সকাল, দুপুর শুয়ে-বসে কাটানোর পর সে একদিন ছাড়া-ছাড়া বেলভেডিয়ার রোডে গিয়ে পৌঁছোত, বাবাকে দেখে আবার ফিরে আসত মেসে।

দিন সাতেক পর অফিসে জয়েন করল হোমী কিন্তু এবার শিফট বদলে গেল তার। যশ তাকে ডেকে বলল, 'ছুটির আগে ডক্টর দত্তকে মিট করেছিলে তুমি হোমী?'

ডা. দত্ত অফিসের মেডিকেল অফিসার। দু'মাস অন্তর অফিসের সবার তার কাছে গিয়ে হেলথ চেকআপ করানো বাধ্যতামূলক।

সে বলেছিল, 'হ্যাঁ!'

'হোমী...,' বলল যশ, 'উনি বলছেন তোমার মানসিক অবস্থা এখন খুব খারাপ। ইউ আর ইন ডিসট্রেস! এই সময় তোমার পক্ষে বেশি কাজের প্রেশার নেওয়া ঠিক হবে না। এবং সম্ভবত তুমি কোম্পানির নিডটা এই মুহূর্তে ফুলফিল করতেও পারবে না সেভাবে। অথচ পুজোর সময়— বুঝতেই পারছ! সবাইকেই প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে। সেইজন্য কোম্পানি ঠিক করেছে তুমি মাস দুয়েক নাইট শিফট করো। তোমার ডিপার্টমেন্টের নাইট শিফটে কোনও কাজ থাকে না! ইউ ক্যান টেক রেস্ট। একটু কাজ করলে, একটু আড্ডা দিলে। মাঝে মাঝে নাও আসতে পারো! আমরা চাই তুমি দ্রুত তোমার শরীর এবং মনের স্বাস্থ্য আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনো। তারপর সেই পুরনো হোমী। নিউ আইডিয়াজ, স্মাইলিং ফেস। উই নিড ইউ হোমী!'

ফলে দ্বিপ্রাহরিক শুয়ে থাকাটা হোমীর বন্ধ হল না। রাত দশটা থেকে শিফট্ শুরু। সাড়ে ন'টা নাগাদ গড়িয়াহাটের মোড় থেকে ট্যাক্সি ধরে সে, দশটায় অফিসে ঢুকে যায়। কোনও কোনও দিন সিট খালি পায় না, স্মিতা, যে কিনা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, দিনের যাবতীয় কাজ এখন ওই দায়িত্ব নিয়ে করে। কাজের চাপে বেচারি মাথা তুলতে পারে না। ও যখন সব কাজ তুলে সিট ছেড়ে ওঠে তখন একাধিপত্যের কম্পিউটারটাকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় হোমী। এবং প্রতিদিনই বেরোনোর আগে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে যায় স্মিতা তাকে, 'হোমীদি, এই ফাইলগুলো কিন্তু স্ক্রিনে খুলবে না, ড্র্যাগ করে নিয়ে নতুন ফাইল বানিয়ে নিয়ে খুলবে, নইলে জানো তো কী হবে?' স্মিতা তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে এমন করে, যেন বুঝতে চেষ্টা করে বিষয়টা আদৌ মনে আছে কিনা তার।

এবং সত্যিই কিছু কিছু জিনিস দিব্যি ভুলে যায় হোমী আজকাল। কখনও কখনও মনে হয় খুব সুপারফিশিয়াল কিছু তথ্য শুধু ভেসে আছে মাথায়, কখনও সেগুলোও ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ ভুস্ করে মাথা তুলছে কোনওটা কোনওটা! তেমন কোনও তথ্য ভেসে উঠলে সে বলতে পারে, 'হ্যাঁ, সিস্টেম হ্যাঙ করে যাবে!'

'প্লিজ হোমীদি, গন্ডগোল কোরো না যেন!'

নাহ্, সে কোনওরকম গন্ডগোল করে না। চুপচাপ বসে থাকে খোলা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে। খালি হয়ে যেতে থাকে অফিস। প্রচুর কথা, প্রচুর শব্দ শেষ উচ্চতায় পৌঁছে রাত বারোটার পর থেকে নামতে থাকে। শেষ নিউজ রিডারের আর মুখের মেকআপ তোলারও ধৈর্য থাকে না। ক্যান্টিনে রাতের বাসন গোছানোর কাজ শেষ করে বেরিয়ে যায় কেটারিং-এর ছেলেগুলো। উজ্জ্বল আলোগুলো কমিয়ে দেওয়া হয় কাফেটেরিয়ার, করিডরের। কনফারেন্স রুমে চাবি পড়ে যায়। সারারাত কফি, বিস্কুট, চিপস এসব সরবরাহ করবে বলে ক্যান্টিনের এক পাশে শুয়ে পড়ে বাচ্চা ছেলেটা, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। আধঘণ্টা পর পরই কফি চাইতে আসে কেউ-না-কেউ।

দুটো-আড়াইটে বেজে গেলে আবার নিঃশব্দে কাজ শুরু হয়ে যায় নিউজ রুমে, ভোর এগিয়ে এলেই স্টোরি লেখা, কাটা, ফেলা— অনিবার্য হয়ে ওঠে সবার জীবনে। জ্বালাতন হয়ে মরে নাইট রিপোর্টার। ঘণ্টায়-ঘণ্টায়

থানায় ফোন করে, দমকলে ফোন করে, 'কোনও অ্যাক্সিডেন্ট? কোনও আগুন?'

হোমী উঠে গিয়ে বসে কাফেটেরিয়ায়। টিমটিমে আলো সেখানে। নিঃশব্দে চলছে এসি। তার চেয়ার টানার শব্দে উঠে বসে ছেলেটা, 'দিদি, কফি চাই?'

সে বলে, 'তুমি ঘুমোও, কফি চাই না!'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ডুবে যায়। কাফের কাচের জানলা পার করে তার চোখ চলে যায় ফাঁকা এ জে সি বোস রোডে। একটা-দুটো গাড়ি সাঁ-সাঁ বেরিয়ে যাচ্ছে। রাত্রিকে ধ্বস্ত করে দিয়ে চলে যাচ্ছে লরি, ট্রাক। এই সময় হোমী বুঝতে পারে তার আর কোনও কাজ নেই, কোনও কর্তব্য নেই, কোনও সংকল্প বা অনুসন্ধান নেই— সমস্ত কিছুর মীমাংসা হয়ে বসে আছে। সে বুঝতে পারে প্রেম, যৌনতা, বন্ধুত্ব ফুরিয়ে গেলেও জীবন অর্গলমুক্ত হয় না— তাই হোমীকে বসে থাকতে হয়! জেগে থাকতে হয় তাকে।

সে জেগে থাকে, নিজের সঙ্গে ছায়ারাজি খেলা খেলে জেগে জেগে— আর তার খুব কাছেই রাস্তার ওপাশেই, সপত্র, সঘন, বিশাল বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে অতন্দ্র নিয়তি তার! তাকিয়ে থাকে তার দিকে একদৃষ্টে! কী অনন্ত ধিকিধিকি প্রেম! সম্মোহিতের মতো হোমী তখন চোখে চোখ রাখে নিজের নিয়তির।

ক্রমে সে দিনে রাতে সবসময়, সর্বত্র দেখতে পেতে শুরু করে ওই যোগী যুবককে। দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে রাখা, দাঁড়িয়ে আছে মেসের উলটোদিকের রাস্তায় কিংবা মেট্রোর সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার আগে আগে। থিয়েটার রোডের ফুটপাত ধরে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসছে পেছনে পেছনে তার! কম্বল লুটোচ্ছে মাটিতে, চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায় ওই লোকটা, ওহ্ আদমি, হোমীকে ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না!

পুজো এসে পড়ে। পুজোয় কলকাতায় ফেরে ললিত। ফোন করে দেখা করতে চায় তার সঙ্গে। সে রাজি হয় দেখা করতে— অনেকদিন পরে ললিতকে দেখতে কী ভীষণ ইচ্ছে হয় তার। যেন মনে হয়, আনন্দ হচ্ছে। মনে হয়, প্রেম না-থাকলেও হৃদয় থেকে কিছুতেই মুছে যায় না। নিজের খুঁজে আনা, নিজের প্রতি ধার্য করা নিজের দুর্বলতাটুকু— ফিকে হতে হতেও থেকে যায় আকাঙ্ক্ষা! মন, মস্তিষ্ক ধুয়ে যেতে যেতেও হারানোর বেদনা থেকে যায়! এও আশ্চর্য লিখন।

দশমীর রাতে বিসর্জনের মিছিল পাশ কাটাতে কাটাতে আলিপুরের একটা পাঁচতারা হোটেলের কফি শপে দেখা হয় তাদের। সে-ই সাজেস্ট করে জায়গাটা, কারণ তারপর বেলভেডিয়ার রোডে যেতে হবে তাকে কিছু ওষুধ ও পথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনে।

ললিত বলে, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোর খুকু? চোখে এত কালি পড়েছে কেন?' সে তাকিয়ে থাকে ললিতের মুখের দিকে, ললিত মাথা নাড়তে থাকে তীব্র আপত্তিতে, দু'হাতে মুঠো করে ধরে তার হাত, 'কী লাভ হল তোর বল তো, আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে?'

ললিত বলতে থাকে, 'সবই ঠিক আছে খুকু— তুই ইমপালসিভ, অবুঝ, আনপ্রেডিক্টেবল, এটসেটরা, এটসেটরা, কিন্তু সম্পর্ক তো তুই-ও তৈরি করেছিলি? সম্পর্কটা তো তোরও, তাই নয় কি? এক মুহূর্তর জন্যও কি তোর মনে হতে পারে না যে, তুইও আমাকে হারালি? খুকু, তোকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তোর রোম্যান্টিকতা আমাকে টেনেছিল। তারপর আমি দেখলাম তোর কোনও বাস্তব জগৎ নেই! কোনও কিছুর প্রতি সে অর্থে রাগ নেই তোর, মায়াও নেই! অথচ তুই। প্রতিশোধপরায়ণ!

‘তোর মনে আছে খুকু লেক গার্ডেন্স, সাদার্ন অ্যাভিনিউ ক্রসিং- এর ঘটনাটা? ক্রসিং-এ গাড়িটা দাঁড়াতেই একটা বাচ্চা ভিখিরি ছেলে জানলায় এসে হাত পাতল, দিদি টাকা দাও না, ভাত খাব! তুই দীর্ঘশ্বাস ফেললি, কিন্তু ভিক্ষে দিলি না! ছেলেটা আরও দু’-তিনবার চাওয়ার পর একটু সরে গিয়ে বলল, শালি, এক চড় খাবি! সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করলি তুই, ছেলেটা তখন অন্য গাড়ির জানলায়, তুই ডাকলি, অ্যাই! তুই কিন্তু হাসছিলি না খুকু, রাগও ছিল না চোখেমুখে। টাকা দেখে ছুটে এল ছেলেটা। এবং তখনই লালবাতি সবুজ হয়ে গেল। ছেলেটা জানলায় আসতেই টাকাটা সরিয়ে নিলি তুই, বললি, এক লাথি খাবি শালা! বেজন্মার বাচ্চা!

‘শেষপর্যন্ত খুকু আমি তোকে বুঝতে পারিনি আদপেই। জীবনের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ আবার ফিরে এলে আমাকে একবার জানাস— আমি ভীষণ খুশি হব সেটা জানলে,’ বলে গেল ললিত। একটা প্যাকেট রেখে গেল তার জন্য। তাতে লিপস্টিক, পারফিউম, বডিজেল, জাপানি হাতপাখা। মেসের মেয়েদের জিনিসগুলো বিলিয়ে দিল হোমী।

একদিন মাঝরাত পার করে ফিড আসতে শুরু করল মুম্বই থেকে— ‘আবু সালেম ধরা পড়েছে পর্তুগালে। মনিকা বেদি আর আবু সালেমকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে বিকেলের মধ্যে মুম্বই!’ শুনতে শুনতে শুনতে হোমীর সমস্ত শরীরে কেমন কাঁটা দিতে লাগল যেন। ঠান্ডা হাতপায়ে ধীরে ধীরে রক্ত সঞ্চালন শুরু হল। এতদিন পরে!

সে দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। ছটফট করে উঠল। যশকে ফোন করল। লাইব্রেরিয়ানকে বলল মুম্বই ব্লাস্টের যাবতীয় রেকর্ড রেডি করতে। সেই সঙ্গে ডি কোম্পানির ওপর যত স্টোরি তৈরি হয়েছে সেগুলো এক জায়গায় করতে। ‘ব্রেকিং চালাও!’ চিৎকার করে উঠল হোমী।

সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দেখে প্রদ্যুম্ন বলে উঠল, ‘এত চেঁচামেচি করছ কেন হোমী? সার্ভারে সব আছে। আমি এক্ষুনি একটা প্রিলিউড তৈরি করে ফেলছি।’

সে বলল, ‘না, না। আবু সালেম ধরা পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া কী হবে আন্ডার ওয়ার্ল্ডে সেটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। আমি মুম্বইতে ফোন করছি।’

ফাঁকা হয়ে যাওয়া অফিসে দেখতে দেখতে আবার ফিরে এল কয়েকজন। একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যেতে লাগল নিউজরুম থেকে পি সি আর সর্বত্র। যখন ভারতীয় ফোর্সের সঙ্গে হাতকড়া পরা সালেমকে প্লেনের সিঁড়ি ভাঙতে দেখা গেল তখন কাঁপন ধরে গেল হোমীর বুকে। আর প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল যখন, তখন সত্যিই শরীরে দেখা দিল সেই কাঁপন। এবং ঠিক তখনই পিছন থেকে কেউ বলল তাকে, ‘আর ইউ অলরাইট?’

সে ঘুরে তাকিয়ে দেখল অচেনা মুখ। হাতে একতাড়া কাগজ। হোমীর সমান সমান লম্বা, ছিপছিপে, ফরসা রং। লম্বাটে মুখ, কালো ঘন চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে জিন্স আর খদ্দরের কুর্তা। অনেকটা দেশ-বিদেশ ঘুরে ছবি তুলে বেড়ায় যেসব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ফটোগ্রাফাররা তাদের মতো চেহারা, হাব-ভাব-ভঙ্গি। একটা বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব করে ছেলেটা বলল, ‘খুব বেশি থ্রিলড মনে হচ্ছে? আন্ডার ওয়ার্ল্ড নিয়ে খুব আগ্রহ?’

সে কী বলবে ভেবে পেল না।

‘এরকম দাঁড়িয়ে কেন? ভয় লাগছে নাকি?’

সে বলল, ‘আবু সালেম ধরা পড়েছে। আই উইশ দাউদ, ছোটা শাকিল, আনিস এরাও দ্রুত ধরা পড়ুক।’

‘তোমাকে কি আগে কখনও দেখেছি?’ সরাসরি প্রশ্ন করল ছেলেটা।

‘বলতে পারছি না!’

‘নতুন? না, নতুন নও।’

‘কী করে বুঝলে?’

‘নতুনদের মধ্যে এত কনফিডেন্স থাকে না।’

কনফিডেন্স? সে তো সমস্ত কনফিডেন্সই হারিয়ে ফেলেছে কবে!

‘তুমি তো নতুন, তোমার দেখছি খুব কনফিডেন্স!’ বলল সে।

‘আমি জাস্ট পুজোর আগে জয়েন করেছি।’

‘আজই প্রথম নাইট মনে হচ্ছে?’

‘একদম! ডে করে গেছিলাম বাড়ি সবে, যশ আবার ডাকল এখন!’

‘হুঁ? তার মানে সিরিয়াস কাজ টেকওভার করার যোগ্যতা দেখিয়েছ ইতিমধ্যেই?’

‘তোমাকে ডে-তে কখনও দেখি না তো?’

‘আমি শুধু রাতে আসি!’

‘যশ আমাকে বলছিল রাতের দায়িত্ব নিতে, রাতে একজন ভাল প্রডিউসার দরকার— বলছিল!’

‘তা হলে তো দেখা হবে রোজই!’

‘দেখি যদি সুট করে। জীবনে রাত জেগে বা ভোরে উঠে পড়াশুনো করিনি আমি।’

‘কী পড়েছ?’

‘মিডিয়া স্টাডিজ। জে ইউ! চেতন চৌধুরী নাম।’

‘চেতন? বাঙালি কি?’

‘চৈতন্য আসলে!’

‘আমি হোমী, এখানে লাইফস্টাইল দেখি— আই মিন দেখতাম।’

এই সময় যশের ফোন এল তার মোবাইলে, ‘হ্যাঁ, যশ বলো!’

‘হ্যালো হোমী। তুমি তো খুব উত্তেজিত!’

‘হ্যাঁ যশ, সত্যি! খুব উত্তেজিত!’

‘তোমার গলায় আবার সেই পুরনো ব্যাপারটা ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে মন খারাপের অসুখ ঝেড়ে ফেলতে পেরেছ তুমি অবশেষে।’

চেতন নামের ছেলেটা চলে যাচ্ছে নিজের ডেস্কের দিকে।

‘অনেক কাজ বাকি হোমী। শীত পড়বে, ফল উইন্টার একটা স্টোরি করো, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, বেড়ানো, পার্টিং! মিডল এজ ক্রাইসিস নিয়ে কী একটা ভেবেছিলে না? আজ বাড়ি চলে যাও, কালকে অফ নাও তুমি। পরশু থেকে পুরনো শিফটে ফিরে এসো,’ যশ বলল।

সে দেখল চেতন কানে হেডফোন লাগিয়েছে, বোধহয় গান শুনছে ও, ঠোঁট মেলাচ্ছে গানের সঙ্গে, একই সঙ্গে আঙুলগুলো দ্রুত ঘুরছে কী বোর্ডের ওপর। হঠাৎ গলা তুলে বলে উঠল, 'তীর্থদা, আটটার প্যাকেজে আজ ছ'টা স্টোরি, ঠিক আছে তো?'

সে নিউজরুম থেকে বেরিয়ে এল করিডরে, একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, 'আমাকে আর ক'টা দিন সময় দাও যশ!'

যশ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, 'বেশ, টেক ইয়োর টাইম!' বলল তারপর।

'দ্যাট ওয়ে বোথ অফ ইউ আর লাকি— মা তো তোমাদের কাছে হাত পাতে না! তবে, আমার সত্যি সত্যি আশ্চর্য লাগে খুকু, চাকরি করে খাওয়াটাই তুমি পছন্দ করলে? আর অলিকে দ্যাখো। খুকু, ইউ কুড হ্যাভ গট আ সেম কাইন্ড অফ লাইফ! তা নয়, একটা ছাপোষা ছেলের সঙ্গে একেবারে প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে সোজা গিয়ে বিয়ে করে বসলে! সকাল থেকে উঠে পাঁই-পাঁই করে ছুটছ— চাকরি করছ!

'ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে হুকুম চালাতে পারতে তুমি খুকু, যদি গোরা সেনগুপ্তর ফ্যামিলিতে বিয়ে করতে তুমি। ওরা তো তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছিল। এই তো সেদিন কৃষ্ণা মোদীদের বাড়িতে দেখতে পেয়েই ছুটে এল অলকা। বলল, 'মিসেস ব্যানার্জি, আপনি মেয়েকে আমায় দিলেন না!' আর তোমার যা মর্কটের মতো চেহারা হয়েছে। ঘুরেও কেউ আর তাকাবে না তোমার দিকে খুকু। তবু যদি বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে পারতে...' বলতে-বলতে ফ্রিজ থেকে এক বাক্স মিষ্টি বের করল।

একটা চন্দ্রপুলি তুলে তাকে এগিয়ে দিল, বলল, 'মিতা এসেছিল, বারবার বলছিল, মাসি তোমার জন্য কিছু করতে পারি না! তা আমি বললাম, চল না, আমাকে একটু পাহাড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবি! বলল, সে তো নিয়ে যেতেই পারি, কিন্তু মেসোমশাইয়ের যা অবস্থা, কী করে তুমি যাবে? খুকু, আমি ওদের সঙ্গে যদি বেড়াতে যাই তোমার বাবার কী হবে? তুমি এসে থাকবে এখানে?'

মিষ্টি হোমী ছুঁয়েও দেখল না। টাটকা থাকতে থাকতে যদি দিত মা, হয়তো খেয়ে দেখত সে।

ক্যাথিটার পরানো আছে বাবাকে, সম্ভবত সেখানে ইনফেকশন হয়ে থাকবে, ডাক্তার ঘোষ আসবেন দেখতে, কিন্তু সাড়ে ন'টার আগে পৌঁছোতে পারবেন না। চেম্বার আছে, অন্যান্য রুগি আছে। ডাক্তার ঘোষের অপেক্ষাতেই আপাতত বসে আছে হোমী বেলভেডিয়ার রোডে। এখান থেকেই নাইট করতে অফিসে যাবে।

মা'র প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ হোমীই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল মাকে, 'তোমার সঙ্গে মি. ব্যানার্জির সম্পর্ক কোনওদিনই কি ভাল ছিল না? কিছুটা সময়ের জন্যও না?'

'কী বলছ তুমি?'

সবসময় জানলা বন্ধ করে রাখা স্বভাব মা'র। জানলা বন্ধ, মোটা ভারী পরদা আপাদমস্তক টেনে রাখা।

'অলি তো জন্মেছিল মা, তোমার আর মি. ব্যানার্জির দাম্পত্যের প্রমাণস্বরূপ!' শান্ত গলায় বলল সে।

চিড়বিড় করে উঠল মা যেন, 'দ্যাট ওয়াজ ওয়ান শট খুকু। দ্যাট ওয়াজ ওয়ান সিঙ্গল শট— বুঝেছ?' থপথপিয়ে কিচেনে চলে গেল মা। ফিরে এল, 'উনি, মি. ব্যানার্জি...' থামল মা, 'উনি তো কিছু করতেই পারতেন না...! আরও বলব? আরও শুনবে? তখন আমার কী-ই বা বয়স বলো? একুশ-বাইশ! সাধ-আহ্লাদ

কম ছিল? রোজ ঝগড়া করতাম আমি এই নিয়ে, বাপের বাড়ি চলে যেতাম! শুধু কি তাই? স্নেহ, ভালবাসাও কি পেয়েছিলাম ওনার কাছে? তার ওপর গিন্নি আর তাঁর মেয়েদের অসভ্যতা! নামেই জমিদার! কী ছোট মন!'

ডক্টর ঘোষ থাকেন যোধপুর পার্কে। বাবাকে দেখেটেখে হোমীকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন উনি। সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে ঢুকল যখন সে তখন সাড়ে দশটা বাজে। রোজই ক্যান্টিনে ডিনার বলা থাকে হোমীর। সে সোজা ক্যান্টিনে ঢুকল ডিনার খেতে। দেখল একটা টেবিলে গৌরী একা বসে ডিনার খাচ্ছে। নিজের খাবারটা নিয়ে গৌরীর টেবিলে গিয়ে বসল হোমী। রুটি, চিকেন স্টু, স্যালাড, মিষ্টি এই আজকের মেনু। ভেজ-দের জন্য পনির ভর্তা! সে বলল, 'কী রে, তোর নাইট?'

গৌরী মুখ তুলল, 'একটু কাজ বাকি রয়েছে। যত রাতই হোক শেষ করে যাব। তাই খেয়ে নিচ্ছি!'

'খুব মন দিয়ে খাচ্ছিস দেখছি?'

'খিদে পেয়েছে'

'আমারও।'

গৌরী দেখল তাকে মন দিয়ে।

'তোমাকে না সেই আগের মতো ফ্রেশ লাগছে আবার। সবকিছু বুঝি ঠিক হয়ে যাচ্ছে হোমী?'

গৌরীর গলার স্বরটা কেমন যেন ঠেকল তার কানে, 'কী ব্যাপার? তোর কোনও প্রবলেম?'

'আমার আর প্রিয়াংশুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল মাস ছয়েক আগে!'

'সে তো জানি।' গৌরী আর প্রিয়াংশু দু'জনেই পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছেলেমেয়ে। পড়তে পড়তেই প্রেম। কলকাতায় ফিরে দু'জনে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে লেক গার্ডেন্সের ওদিকে কোথাও। কিন্তু একসঙ্গে থাকতে শুরু করে দু'জনেই বুঝতে পারে তারা একত্রে থাকার উপযুক্ত নয়।

গৌরী বলল, 'লাস্ট উইক প্রিয়াংশু চিঠি লিখেছিল একটা। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ও এল। দেখা করল। আসলে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে ও এখানে, আমার কাছে হোমী!'

'কী প্রস্তাব?'

'হি ওয়ান্টস টু ম্যারি মি।'

'তাই?' খুশি হয়ে উঠল হোমী সঙ্গে সঙ্গে। 'তার মানে হি'জ কামিং ব্যাক টু ইউ?'

গৌরী মাথা নাড়ল। তা নয়। ফ্রান্সের একটা বড় হাউস, তারা সিনেমা বানায়— প্রিয়াংশু তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভিসা নিয়ে ফ্রান্সে এখন ভীষণ কড়াকড়ি। তাই ভিসা পাচ্ছে না। যদি বিবাহিত হয়, যদি স্ত্রী চাকরি করে এদেশে তা হলে ভিসা পেতে অতটা অসুবিধা হবে না ওর! তাই।

গৌরীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। রুটির টুকরো মাংসের ঝোলে ডুবিয়েছিল হোমী। কিন্তু মুখে তুলতে পারছে না। গৌরী বলল, 'কী অপমানজনক প্রস্তাব! তবু হোমী আমি ওকে না বলতে পারলাম না। ও আমাকে ছেড়ে গেছে, হি নেভার কেয়ারড ফর মি। আজ আমার হৃদয়ের ওপর দিয়ে একটা রোডরোলার চালিয়ে দিল — তাও আমার মনে হল এত বড় সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে? সুযোগটা তো ও ওর যোগ্যতা দিয়েই পেয়েছে। প্রিয়াংশু বলল, আমাদের রিলেশনের কোনও ফিউচার নেই গৌরী, তবু তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

হোমী বলে উঠল, 'তুই কেন? আর লোক নেই?'

'কারণ ও জানে যে, ও চাইলেই আমি ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেব। ওর নাকি আমার ওপর দারুণ ভরসা। ও বলছে, এই বিয়েটাকে আমি যেন কোনও শেকল না-মনে করি। আমি যেন মন চাইলে যা-খুশি করি। ওর তাতে কোনও অবজেকশন নেই!'

হোমী বলল, 'প্রিয়াংশু খুব ভাল সিনেমা বানাতে পারবে গৌরী। নো ডাউট!'

গৌরী বলল, 'আমরা রেজিস্ট্রির নোটিশ দিলাম আজই। ও আবার উড়ে গেল মুম্বই। কী জানো, ও এত কিছু করল, প্রথমে বলল লিভ ইন করবে, পরে বিয়ে করবে, তারপর বলল তোমার সঙ্গে থাকা যায় না, আবার এখন আমার ওপর ওর এত দাবি, এত ভরসা— কিন্তু আমার ভালবাসাটা এতসবেও মরেনি। রেজিস্ট্রির ফর্মে সই করতে আমার ভালই লাগল। আমি তো ওকেই চেয়েছিলাম।'

গৌরী উঠে গেল আর ক্যান্টিনের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে এল চেতন। এসে তার টেবিলেই বসল। খাকিজ় পরেছে ছেলেটা। সঙ্গে হ্যান্ডলুমের শার্ট। স্মার্ট দেখাচ্ছে। ফরসা গালে হালকা দাড়ির আভাস তৈরি করেছে যত্ন করে। আসলে রোজই তার সঙ্গে চেতনের দেখা হয় অফিসে, পুরো শীতটাই চেতন একটা কালো জ্যাকেট ধরনের জিনিস পরে অফিসে আসছিল। শীত চলে গেছে ফাইনালি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এখন। জ্যাকেটটা পরেনি আজ আর চেতন। তাই অন্য রকম লাগছে দেখতে! ঝরঝরে লাগছে।

চেতন বসে বলল, 'কেমন রেঁধেছে চিকেনটা?'

'ভাল! একটু বেশি অয়েলি।'

'তাও খাব, টুডে ইজ মাই লাস্ট ডে হিয়ার। আর আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

একটা একদম অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার ধাক্কা খেল হোমী। লাস্ট ডে? আসলে ক্রমশই নাইট শিফটটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল হোমীর কাছে। অনেকটা চেতনের জন্যই। ডে শিফটের কেউ কেউ বলত, হোমী, তোমরা নাকি খুব মজা করো নাইটে? কেমন মজা তা চাখার জন্য আদিত্য, সৌভিকরা মাঝেমধ্যে থেকে যেত নাইট করবে বলে। সত্যিই ফুর্তি হত, তর্কবিতর্ক, ঝগড়া হত, টেবিল বাজিয়ে গান। একদিন জেনিস জপলিনের বিখ্যাত ন্যুড টাঙিয়ে হইচই ফেলে দিল চেতন অফিসে। কেউ বলল সরাও, কেউ বলল থাকুক। যশ সকালে খুলে নিয়ে চলে গেল পোস্টারটা। বলল, 'আমার বেডরুমে রাখব।'

চেতনের আর একটা জিনিসও মুগ্ধ করেছিল হোমীকে। আড্ডা দেওয়ার সময় এক রকম— কিন্তু কাজ করত যখন তখন একেবারে আলাদা মূর্তি ধারণ করত ছেলেটা। ওর মনমতো না-হলে ছুড়ে ফেলে দিত কপি। ডে শিফটে করে যাওয়া কাজে ভুল পেলে মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে গালাগালি করত চেতন ভ্রান্তিকারীকে। রাত্রে ও প্রায় নিয়ে ফেলেছিল যশের পজিশন। কখনও কখনও সারারাত নাইট শিফট করার পরও বাড়ি যেত না চেতন। যশের সকালেও দরকার পড়ত ওকে।

'লাস্ট ডে কেন?' জানতে চাইল হোমী।

'আমাকে হেড অফিসে চলে যেতে হচ্ছে!'

'তুমি যেতে চেয়েছিলে?'

'না। অফিস পাঠাচ্ছে!'

'তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি?'

'নিশ্চয়ই কেন?'

'মুম্বই মানে সর্বভারতীয় স্তরে কাজ করতে পারা। অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, মোটা পে প্যাকেট।'

'হ্যাঁ, সে সবই আমার মাথায় আছে! কিন্তু এখানেও অনেক কিছু ছিল যা আমার পছন্দের। চলে গেলে সেসব মিস করব!'

'যাচ্ছ কবে?'

'রবিবার সকালে।'

'এই ক'দিন তা হলে আর অফিসে এসো না।'

'না, আসব। আসতে ভাল লাগে। তুমি আছ!'

তার খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। হাত ধুতে উঠছিল সে।

চেতন বলল, 'হোমী?' সে তাকাল ঘুরে চেতনের দিকে। চেতনের চোখ তাকে আশ্চর্য সংকেত দিল কিছু। চেনা সংকেত। এরকম চোখ সে আরও দেখেছে। স্ফটিকের মতো দৃষ্টি। চেতনকে তিন মাস ধরে সে নানারকমভাবে দেখেছে। কিন্তু এরকম চোখ দেখেনি, এরকম স্বর শোনেনি কখনও।

চেতন তার এঁটো মাখা হাতটা চেপে ধরল, 'হোমী, তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।'

যারা খাচ্ছিল বসে সবাই দেখছে দৃশ্যটা। সে বলল, 'আমি হাত ধুয়ে আসি?'

'ক্যান উই গো আউট ফর সাম টাইম?' সবাইকে শুনিয়ে বলল চেতন।

রাত এগারোটা বেজে গেছে তখন। চেতন আর সে পথে নামল। ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগল এ জে সি বোস রোড ধরে।

মিন্টো পার্কের কাছে পৌঁছে প্রথম কথা বলল চেতন। বলল, 'কতগুলো ক্লিশে বলতে যাচ্ছি আমি তোমাকে!'

হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালের সামনে দাঁড়াল চেতন, 'চলো, ভেতরে যাওয়া যাক! এত রাতে পাঁচতারা ছাড়া কিছু খোলা থাকে না।' চেতন আলতো হাত রাখল তার পিঠে।

দোতলার লাউঞ্জে পাতা সোফাগুলোর একটায় বসে পড়ল তারা। সেখানে একটাও লোক নেই! চেতন বলল, 'শোনো হোমী, আমার হাতে সময় খুব কম। আমি জানতে চাই, আমার সম্পর্কে তুমি কী ভাবো? তুমি কি অস্বীকার করবে যে, আমাকে পছন্দ করো? যশকে বলেছিলাম তোমার প্রতি আমার অনুভূতির কথা। যশ বলেছিল, নিজেকে সামলাও, হোমী সুস্থ নয়। ইমোশনাল স্ট্রেস ও নিতে পারবে না। বরং ওর বন্ধু হয়ে উঠতে চেষ্টা করো চেতন। মেক হার স্মাইল। হোমী, তোমাকে কতরকমভাবে হাসাবার চেষ্টা করেছি আমি তুমি নিজেই বলো?'

তারা যেখানে বসে আছে তার থেকে একটু এগিয়ে বাঁ হাতে ঘুরলেই সেই ব্যাঙ্কোয়েট যেখানে এরকমই একটা রাতে ললিতকে প্রথম মিট করেছিল হোমী। চেতন বলল, 'তুমি কি এখনও ম্যারেড হোমী?'

ললিত? ললিতের বউ কি বউ নয় সে আর?

'সবাই বলে, বিয়েটা ভেঙে যাওয়ায় এত ভেঙে পড়েছ তুমি! সত্যি কি তাই? সত্যি কি বিয়ে ভেঙে গেছে বলে এত ডিপ্রেসড তুমি?'

চেতন যখন এসব বলছিল তখন হোমীর মনে হল তার শরীর পাথরের, মন পাথরের, হাত-পা পাথরের। আর মাথা? জড়বুদ্ধির।

চেতন বলল, 'প্রথম দিন! প্রথম দিন থেকে আমি তোমাকে নোটিশ করেছি। প্রথম দিন থেকে আমি তোমাকে পছন্দ করেছি। আর এখন আমি তোমাকে ভালবাসি! আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমায় কখনও কষ্ট দেব না!'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। চেতন চোখ মারল তাকে, 'এই, লিসন, আমি তোমাকে ছাড়ছি না। ছাড়ব তখনই যখন তুমি বলবে, "নো, আই ডোন্ট লাইক ইউ অ্যাট অল!" আর সেটা তুমি বলতে পারবে না। কারণ আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দেব— আই উইল কিস ইউ হার্ড।' চেতনের মুখে এখন কোনও হাসি নেই। কপালে ফুলে উঠেছে একটা রগ, ভুরু বেঁকে আছে, চেতন তাকিয়ে আছে তার ঠোঁটের দিকে, 'একটু আগে মাংসের লাল ঝোলটা ঠোঁটে লেগে গেছিল যখন ইচ্ছে করছিল সবার সামনে চেটেচুটে সাফ করে দিই! উফ্, হোমী, ক্যান আই কিস ইউ?' চেতন বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা রাখল তার ঠোঁটের ওপর।

মুহূর্তে সমস্ত শরীরে দাউ দাউ আগুন ধরে গেল হোমীর। সে পাথর ছিল, গলে যেতে সময় নিল না। নরম সোফায় দু'হাত কোলের ওপর জড়ো করে অসহায় বালিকার মতো বসে থাকতে থাকতে সে দেখল তার প্যান্টি ভিজে যাচ্ছে এত সামান্যতেই। এত সামান্য প্রস্তাবে, এত সামান্য স্পর্শে। এবং তার ইচ্ছে হল একটা নতুন সম্পর্কে অংশ নিতে, একটা নতুন মৈথুনে ঝাঁপাতে। প্রেম কাম মোহের এই অন্তহীন স্রোতে গা ভাসাতে!

সে একটা ঘোরের মধ্যে বলে বসল, 'এসো, চুমু খাও আমায়!'

চেতন থমকাল, 'আগে বলো তুমি আমাকে ভালবাসো?'

সে বলল, 'ভাল না-বাসলে কি চুমু খাওয়া যায় না?'

'সে তো আমিও কত খেয়েছি,' চেতন তার গাল টিপে ধরল, 'কিন্তু যাকে ভালবাসি তার কাছে প্রেমবিহীন চুমু চাই না অন্তত।'

সে বলল, 'ললিতও ঠিক তাই চেয়েছিল। ভালবেসেছিল বলে ভালবাসা চেয়েছিল। শুধু ভালবাসলে কিন্তু সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যেই ভালবাসার বদলে ভালবাসা চায় কেউ তখনই গড়ে ওঠে সম্পর্ক। আর অমনি তার মধ্যে আরোপিত হয় নিয়তি!'

'নিয়তি কেন?'

'নিয়তিই তো সব— তুমি বুঝতে পারো না?'

চেতন ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সে বলল, 'কাউকে বোলো না চেতন, আমার নিয়তি সব সময় আমাকে ফলো করছে। আমার নিয়তি চায় না আমি কোনও সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করি। সে চায় আমি শুধু তার থাকব। তার একার। এসব পাগলের প্রলাপ শোনালেও আসলে সত্যি!'

চেতন বলল, 'কতদিন ধরে এরকম হচ্ছে তোমার? নিয়তি পিছু নিচ্ছে?'

'অনেকদিন হয়ে গেল!'

'হোমী, তোমায় একটা কথা বলব, টানা এতদিন কেউ নাইট করে না। তুমি নাইট শিফট বন্ধ করো। কিছুদিন ছুটি নাও, একটু বেড়িয়ে এসো। তারপর রেগুলার সময়ে অফিস করো। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে!'

'দেখি,' বলল সে।

'আমার খুব খারাপ লাগছে হোমী। আমি এখানে থাকলে তোমাকে এমন কিছুতে ইনভলভ করতাম যে, তোমার এইসব চিন্তা উবে যেত। আমরা প্রচুর কাজ করতাম, আড্ডা দিতাম, বেড়াতে যেতাম, পার্টি করতাম, তুমি আবার অমলিন হাসতে পারতে।'

'কিন্তু আমি তো হাসতে চাই না চেতন। হাসি, কান্না এসব ভাল লাগে না আমার— বোকা বোকা লাগে। মনে হয় আরোপিত, কৃত্রিম, প্রিডেস্টিন্‌ড!'

'তোমাকে এসব কে বুঝিয়েছে?'

'একজন পামিস্ট! মিস্টার বেদ!'

'কোথাকার?'

'কলকাতারই!'

'কোথাও চেম্বার আছে?'

'হ্যাঁ, জগুবাজারে!'

'কখন বসেন?'

'সন্ধে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত!'

'কাল যাব আমি লোকটার কাছে, দেখি আমায় কী ভুজুংভাজুং দেয়? তুমি ঠিকানাটা বলো!'

'ঠিকানাটা তো জানি না! এমনিই ঢুকে পড়েছিলাম একদিন। কিন্তু তখন অলরেডি একটা সাধু আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে!'

'বেশ, যাওয়ার আগে অন্তত তোমার একটা কাজ করে দিয়ে যাই, লোকটার নাকটা ভেঙে দিয়ে যাই। চলো চেম্বারটা দেখিয়ে দেবে!'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখনই! তারপর তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেব।'

একটা ট্যাক্সিতে তোলে তাকে চেতন, বলে, 'কোথায় তোমার নিয়তি? আছে আশেপাশে?' হোমী চেতনের হাত শক্ত করে চেপে ধরে। চেতন তাকায় তার দিকে, 'কোনও ভয় নেই। আমি আছি!' সে মাথা নাড়ে। জগুবাজারে এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় তারা। সে ফুটপাত ধরে হাঁটে। দেখে, বড় বড় সব লরি আনলোড করা হচ্ছে। যেন অর্ধেক নিদ্রিত— এরকমভাবে মাথায় করে মোট বইছে মোটবাহকরা। খুব নীরব তাদের চলাফেরা। সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে হোমী সেই জায়গাটায় পৌঁছোয় যেখানে দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ডটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সেটা এখন আর নেই। সে আগে-পিছে তাকায় এগোয়-পিছোয়, কিন্তু সাইনবোর্ড, গলির মতো বাড়ির প্রবেশপথটা, কোনও কিছুই দেখতে পায় না। চেতন বলে, 'কোথায়? ঠিক জায়গায় এসেছ কি?'

সে ধন্দে পড়ে, 'হ্যাঁ, এখানেই তো, এখান দিয়েই একটা পুরনো লাল বাড়ি!'

চেতন বলে, 'সব তোমার মনের ভুল। কিছু নেই এসব। কোনও মি. বেদ নেই! চলো, বাড়ি চলো!'

'বাড়ি নয়, মেস!' বলে সে।

'চলো, নামিয়ে দিই!' চেতনকে ভীষণ চিন্তিত দেখায় আর তার মনে হয় চেতন তার ভীষণ আপন। এমনকী ললিতের থেকেও বেশি আপন।

মেসের সামনে নামায় তাকে চেতন, 'একজনকে বিশ্বাস করো হোমী, নিয়তি-টিয়তি কিছু নেই। জন্ম আর মৃত্যুটাই নির্দিষ্ট শুধু— বাকি সব তোমার হাতে। পরিস্থিতির খুব বড় ভূমিকা আছে আমাদের জীবনে, কিন্তু মানুষ নিজের হাতে পরিস্থিতি ভাঙতে-গড়তে পারে। আমরা মানুষ এটা ভুলে যাচ্ছ তুমি, আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে কাজে, কাজ করায়! হোমী, তুমি বিবেকানন্দ পড়ো, অরবিন্দ পড়ো, দ্যাখো এই নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে কত কী লিখেছেন ওঁরা। নিয়তি কিছু নয়, নিয়তি কেউ নয়, আমাদের সময়ের ওপর শুধু আমাদেরই হাত আছে, তোমার ধর্মই নিয়তির ধর্ম, নিয়তিকে অগ্রাহ্য করো হোমী, এভাবে সমর্পণ কোরো না। ইগনোর করো! যদি নিয়তিই ধ্রুব বলে ধরে নিয়ে থাকো তা হলেও, তা হলেও জীবন যে বহতা নদী তার পাড়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, জলে ঝাঁপাও, প্রবল সাঁতার দাও, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, সময় একটা টায়ারের মতো, আমাদের বর্তমানই ভবিষ্যৎ— এসো হোমী, জীবন অসাধ্য সাধন শুধু, তবু নিজেকে প্রয়োগ করো তুমি'।

সে মেসের বিরাট কাঠের দরজার গায়ে লাগানো বেল টিপতে থাকে একজন রাতপরি এসে দরজা খুলে দিয়েই চলে যায়, চেতন হাত বাড়ায় আর সে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাধ্যবাধকতা ভুলে, ত্রাস ভয় ভুলে, ব্যাখ্যাতীত নিয়তিকে ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেতনের বুকে। বুকে মুখ ঘষতে থাকে, বলে, 'আমাকে নিয়ে চলো, অনেক দূরে কোথাও নিয়ে চলো!'

'মুম্বই যাবে— বলো? আমি তৈরি হোমী।'

সে কাঁদে আর কাঁদে। কতদিন পরে যে কাঁদে তার আন্দাজ নেই। বলে, 'যাব, যেখানে নিয়ে যাবে, যাব!' চেতন ঠোঁট স্পর্শ করে তার। চুম্বন নয় যেন ঠোঁট দিয়ে বুঝ দেয় ঠোঁটকে। হোমী চেতনের ঠোঁটের স্পর্শ পেতেই বহুকাল জেগে থাকা ভূতগ্রস্ত সত্তার মতো যেন ঢলে পড়ছিল ঘুমে, হঠাৎ একটা অস্বস্তিতে চোখ মেলল সে। দেখল চেতন নয়— জটাধারী! বিছের মতো কালো ঠোঁট। চোখেমুখে চিড়বিড় চিড়বিড় করছে বিদ্যুৎ। জটায় জটায় দাড়িতে গোঁফে শতাব্দীর পর শতাব্দী রোদ ঢোকেনি যে অরণ্যে— তার গন্ধ। বাহুপাশ নয়, দুটো ময়ালের বেড়। সে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেল কিন্তু পারল না। চেতন বলে উঠল, 'কী? কী হল হোমী?'

সে দেখল চেতনই। হ্যাঁ! চেতন! নিয়তির মুখ দিয়েই নিয়তি অগ্রাহ্য করার বাণী বেরোয়? ঘোর নিষ্পাদনযোগ্য হয়ে ওঠে নিয়তির ধর্ম? হা! হা! হা! এ কত বড় ঠাট্টা! সে ধাক্কা দিল চেতনকে!

'হোমী! হোমী! কাছে এসো,' ডাকল চেতন।

সে দেখল ডান হাতের রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে আসছে। এক লাফে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে হোমী চিৎকার করে উঠল, 'পালাও, পালাও। হোমী পালাও!'

বেনারস— দ্বিতীয় সংবিৎ

চোখ খুলতেই একটা বিরাট বড় সিঁদুরের টিপ পরা মুখ চোখে পড়ল হোমীর। সিঁদুরের টিপের সঙ্গে ধ্যাবড়ানো হলুদ টিপ একটা, চোখে পুরু কাজল, ওপরে-নীচে করে লাগানো। মেয়েটা তাকে দেখতে লাগল পলক না-ফেলে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। সেও দেখল মেয়েটাকে। তারই বয়সি, শ্যামবর্ণা, একটা মেরুন স্লিভলেস ব্লাউজ, মেরুন শাড়ি গাছকোমর করে পরা। শাড়িটা প্রায় ভেজা অবস্থায় আষ্টেপৃষ্ঠে কামড়ে রয়েছে শরীর। পিঠময় এলো চুল, দু'হাত ভরতি নানা রঙের কাচের চুড়ি। চকচক করছে মুখ, হাতের চামড়া। মেয়েটা যত না সুন্দরী, কিন্তু চাবুকের মতো দেহলতা! আঁট! এবং ভরাটও।

মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায় বাঙালি মেয়ে। এবং বিশুদ্ধ বাংলায় 'কী কেমন লাগছে?' বলেই তার উত্তরের অপেক্ষা না-করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সে উঠে বসল আস্তে আস্তে— তাকাল চারিদিকে ভাল করে। অদ্ভুত ঘর একটা। অন্ধকারই বললে চলে। ছোট্ট একটা কাঠের দরজা মুখোমুখি খোলা বলে সে দেখতে পেল দরজার ওপাশেই বিরাট উন্মুক্ত একটা চাতাল। রোদ পড়ে ভেসে যাচ্ছে। একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর পাঁপড় জাতীয় কিছু শুকোচ্ছে। কাছাকাছি রাখা আচারের বয়াম, অনেকগুলো।

রোদ দেখে তার ধারণা হল খুব বেশি হলে বেলা এগারোটা বাজবে!

বাইরে অত রোদ অথচ এ ঘরটা অন্ধকার। ঘরটায় কোনও জানলাই নেই। অনেক উঁচু সিলিং। সিলিং-এর শেষ মাথায় হাতখানেক চওড়া চওড়া কতগুলো ওপেনিং। ভাল করে দেখে মনে হল তার কারুকার্য করা জাফরিগুলো পাথরের। সেই একই রুক্ষ, গেরুয়া আর বাদামি মেশানো রঙের পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে ঘরের মেঝে, চাতালের মেঝে। এরকম ঘর সে কখনও চোখে দেখেনি। এবং এত বড় ঘর। এ যেন কোনও অট্টালিকার অংশ। সিলিং-এ আখাম্বা কড়িবরগায় আলকাতরার পোঁচ, অতি পুরনো এই ঘরদরজা বোঝাই যায়। কিন্তু ওয়েল মেনটেনড।

বাইরে মেয়েলি কণ্ঠস্বর অধ্যুষিত কোলাহল। চুড়ির শব্দ! চাতালের দিক থেকে নয় বরং দেওয়ালের পিছনের দিকে থেকে ভেসে আসছে গান। ভজন। নিজেকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করল হোমী। কোথায় এসে পড়ল? মেয়েটা তাকে যেভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে,' তারপর হাট-খোলা রেখে চলে গেল দরজা— তাতে মনে হল না কোনও ভয়ংকর জায়গায় এসে পড়েছে!

এই সময় সামনের দেওয়ালে একটা অতিকায় টিকটিকি দেখে স্থির হয়ে গেল সে। এত বড় টিকটিকি! লেজটা নীচের দিকে বেঁকে গেছে ভারে। ত্রাস- অদ্ভুত ত্রাস সৃষ্টি হল তার মধ্যে টিকটিকিটাকে দেখতে দেখতে। তখন দরজায় এসে দাঁড়াল কেউ। সে ফিরে তাকাতে সাহস পেল না! দরজায় যে এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে একটা জটলা। কিন্তু সে জটলা নিরুচ্চার। শৃঙ্খলাবদ্ধ! শুধু চুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

না-তাকিয়েও সে বুঝল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক নারীমূর্তি।

'আর ইউ অ্যাফরেড অফ দিস ক্রিচার?'

তার চোখ জ্বালা করছিল, সে মাথা নাড়ল।

'ইসকো বাহার করো!' নির্দেশ দিল কণ্ঠস্বর।

মৃদু গুঞ্জন উঠল একটা। একজন, দু'জন হাসলও যেন, তারপর লম্বা লাঠি একটা এগিয়ে গেল টিকটিকিটার দিকে। কে ধরে আছে লাঠি, তাড়াতে চেষ্টা করছে, তাও দেখল না সে। চোয়াল শক্ত করে বসে টিকটিকিটাকেই দেখতে লাগল যতক্ষণ না জাফরি দিয়ে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে। নড়তে কষ্ট হচ্ছে এভাবে মোটা পেট নিয়ে বের হয়ে গেল সরীসৃপটা। আর ভীষণ ভীষণ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইল তার শরীর।

'ইটস গন!' এবার সে ভাল করে তাকাল মহিলার দিকে। চমকে ওঠার মতো সুন্দর চেহারা। কলকাতায় সে কখনও এমন রূপসি নারী দেখেনি। পাঁচ আট-নয় ইঞ্চি দীর্ঘ শরীর, বিরাট স্ট্রাকচার, এতখানি কাঁধ। থামের মতো ঊরুদেশ। কিন্তু নির্মেদ। ক্রিমরঙা মলমলের শাড়ি ভেদ করে ফুটে উঠেছে ভারী স্তনযুগল, এমনকী নাভির গোলাকার চাঁদটার গভীরতাও কী স্পষ্ট বেশি! পাতলা নাকে বিরাট হিরের ফুল, কানেও হিরে ঝকঝক করছে। ডান মণিবন্ধে একটা সরু কালো ব্যান্ডের ঘড়ি। বাঁ হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে পরা হিরের চুড়ি। কণ্ঠপ্রদেশ নিরাভরণ কিন্তু কণ্ঠস্বর এমন তীক্ষ্ণ, ললিত, পরিষ্কার যে তাকেই অলংকার বলা যায়। চোখ দুটো ছোট ছোট কিন্তু টানা টানা। দৃষ্টিতে মাধুর্যকে ছাপিয়ে চোখে পড়ে বুদ্ধি। সর্বাঙ্গে এমন আভিজাত্যের চিহ্ন যে, হোমী তাকিয়ে দেখতেই থাকে মহিলাকে এবং দেখতে দেখতেই বুঝতে পারে ইনিই এই অট্টালিকার মালকিন। এইখানে উপস্থিত বাকি সকলের কর্ত্রী। এবং এক ধরনের উদারনৈতিক ক্ষমতাভোগে অভ্যস্ত!

সে কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই মেরুন শাড়ি, সিঁদুরের টিপ পরা বাঙালি মেয়েটা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কথা বলে ওঠে, 'মাছেরি টাঙিয়ে দেব? বেনারসে টিকটিকি ভরতি, অত ভয় পেলে চলবে? আরও বড় বড় টিকি আছে!'

ভদ্রমহিলা মৃদু আপত্তি করেন, 'চন্দ্রা, মত করো ইয়ে!' তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'চায়ে পিজিয়েগা?'

সে বলে ওঠে, 'আমি এখানে কী করে এলাম? কবে এলাম? আজ কত তারিখ? আই মিন হাউ...?'

'সমঝ গয়ী! আমি বাংলা বুঝি। আমার গুরু ছিলেন যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য। একটাও হিন্দি শব্দ বলতেন না!' উনি কান স্পর্শ করলেন। বসলেন তক্তপোশের এক ধারে। 'কাল চন্দ্রা আপনাকে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নিয়ে এসেছে। আপনি নিজেই এসে ওর হাত ধরেছিলেন, ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন আপনি,' হিন্দিতে বললেন তিনি।

সে আবার তারিখ জানতে চাইল। 'ফেব্রুয়ারি, টোয়েন্টি সেকেন্ড,' বললেন মহিলা। মানে মাঝখানে তিনটে দিন। তার স্পষ্ট মনে পড়ল চেতনের সঙ্গে যখন মিস্টার বেদের চেম্বার খুঁজছে তখন একবার মোবাইলে সময় দেখেছিল— উনিশ ফেব, ১২-৪৫ এ.এম। তারপর? শুধু দুটো-একটা দৃশ্য ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না তার! সমস্তটাই সে ভুলে গেছে? আশ্চর্য!

'আমার ব্যাগ, মোবাইল?' এটাই প্রথমে মনে পড়ল হোমীর।

ঘরে উপস্থিত সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। চন্দ্রা বলল, 'সঙ্গে কিছু ছিল না।'

'অনেক প্রশ্ন করে এখন বিরক্ত করব না আপনাকে। আপনি চায়ে খান, শুয়ে থাকলে শুয়ে থাকুন, আইনা আপনার কাছে থাকবে, সব হেল্প করবে, ইনকে লিয়ে টুথব্রাশ লা দো!'

চন্দ্রা বলল, 'বিবিরানি, আপনি ভাবছেন আমি ওকে বিরক্ত করব?'

মহিলা তর্জনী তুললেন, 'না যদি করো তা হলে তুমি থাকতে পার। লেকিন মুঁহ বন্দ!' তারপর তার দিকে ফিরলেন, 'আপনাকে কী বলে ডাকব?'

সে লক্ষ করল ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর সুন্দর শুধু নয়, ভাষার ব্যবহারও অন্যরকম। অন্যকে খাতির করার একটা ব্যাপার আছে। যার সঙ্গেই বাক্যালাপ করছেন, সেই মুহূর্তে তাকে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছে এঁর শব্দ। বিবিরানি? এই বুঝি নাম?

'আমি হোমী!'

'আপনি এখানে একেবারে সেফ! কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না আপনার। টেক রেস্ট। যা লাগবে চন্দ্রাকে বলবেন, চন্দ্রা আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে।'

যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন বিবিরানি, 'কাউকে কিছু খবর দিতে হবে? ফোন করবেন?'

সে ভাবল, মাথা নাড়ল, 'না!'

'ফির আপসে লাঞ্চ পর মিলতেঁ হ্যায়।'

ভদ্রমহিলা কে, কী নাম— তা এখনও জানে না হোমী, কিন্তু এ-বাড়ির পরিবেশ, মানুষগুলো সবকিছুই এত নতুন তার পক্ষে, এত বিচিত্র, যে মনে ছাপ ফেলতে লাগল দ্রুত। মহিলাকে খুব ভাল লেগে গেল তার। উনি চলে যেতেই ওঁর পিছন-পিছন দু'জন বেরিয়ে গেল। চন্দ্রার সঙ্গে আরও দু'জন দাঁড়িয়ে রইল ঘরে। একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে বলল, 'আপকা ফোন, বটুয়া সব খো গয়া?'

ব্যাগে টাকা ছিল, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ছিল, প্রেস কার্ড ছিল, আরও অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। বেলভেডিয়ার রোডের ফোন নম্বর, অফিসের নম্বর তার মুখস্থ। কিন্তু এ ছাড়া সব নম্বর মোবাইলেই স্টোর করা থাকে। এসব হারিয়ে যাওয়া মানে আত্মচরিত হারিয়ে যাওয়া! ধুতি-শার্ট পরা এক বয়স্ক ব্যক্তি একটা ট্রে-তে চা নিয়ে ঢুকল এই সময়, ট্রে-টা কি রুপোর? পেয়ালা-পিরিচ সাদা ধবধবে। বৃদ্ধ খুব বিনীত হেসে বলল, 'পি লিজিয়ে, গরমা গরম চায়! আচ্ছা লাগেগা!'

তিন দিন কোথায় কেটেছে তার মনে নেই। স্নান করেনি নিশ্চয়ই, খেয়েছিল কিনা জানে না, মুখ ধোয়নি। কয়েকটা অচেনা মানুষ তাকিয়ে আছে এখন তার দিকে— তাদের চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু এমনই সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ যে, 'এরা কারা' এ-প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে না। সে ভীষণই কমফর্টেবল ফিল করছে এই মুহূর্তে। ব্যাগ বা ফোন হারিয়ে যাওয়ার পর আরও একা বোধ করছে এবং নিজেকে নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাবতে চাইছে না। সে যে আপাতত এখানে এসে পৌঁছেছে এই সত্যের মধ্যেই সমাহিত হতে চাইছে কিয়ৎক্ষণ। সে কি হিসেববহির্ভূত কাজ করেছে কোনও? না করেনি। সে নিয়তির চক্রের মধ্যেই ঘুরছে।

চন্দ্রা বসে পড়েছে বিছানায়, 'কাল সন্ধে থেকে ঘুমোচ্ছ, আরও ঘুমোবে? নাকি উঠবে এবার?

'আমি মুখ ধোব।'

'ধুইয়ে দেব?'

'না!'

বৃদ্ধ হিন্দিতে বললেন, 'আপনি সাফসুতরো হয়ে নিন, আমি আরও এক কাপ চা এনে দেব!'

চন্দ্রার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল হোমী। চাতালটা বিরাট, চারপাশে ঘর, ডান হাতের, বাঁ হাতের ঘরগুলোয় জানলা আছে কিন্তু পাল্লা নেই। চৌকো গর্তে পাথরের জাফরি, একটা সিঁড়ি উঠে গেছে চাতালের ওপর দিয়ে ছাদে। সিঁড়িটাও পাথরের, মেঝে এত অসমান যে, তার নজর টানল। ঘরের মেঝে, চাতালের মেঝে সব এবড়োখেবড়ো! এটাই অন্যতম বিশেষত্ব এই হর্ম্যের।

চন্দ্রা তাকে ঢুকিয়ে দিল যেখানে বাথরুম বলে, সেটা একটা গোলকধাঁধা। এবং দরজাবিহীন! ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে একটা ছোটখাটো চাতালে পৌঁছল সে। অন্ধকার। কোথা থেকে সামান্য আলো আসছে বোঝা যায় না! একটা চৌবাচ্চায় জল ভরতি। কিন্তু ভাল করে লক্ষ করে বুঝল প্রাচীন এই স্নানাগারে শাওয়ার থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক ব্যবস্থাই রয়েছে। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল চন্দ্রা। তার গা ছমছম করছিল। একটা নতুন ব্রাশ, পেস্ট হাতে চন্দ্রা ফিরে এলে সে বলল, 'এখানে আলো নেই?'

'ও হ্যাঁ, জ্বালছি,' বলে আবার চলে গেল ও। এবং আলো জ্বলে উঠল বাথরুমে। কিন্তু পাথুরে ঠান্ডা আর অন্ধকার বালবের আলোকে গ্রাহ্যই করল না। চন্দ্রা ফিরে এল, 'কাল আমার হাত এমন করে চেপে ধরেছিলে তুমি যে দাগ বসে গেছে! তোমাকে বোধহয় কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছিল! সত্যি, বেনারসে বেহুঁশ ঘুরতে ঘুরতে তুমি কিনা বদমাইশ লোকের হাতে না পড়ে আমাকে চেপে ধরলে? তাজ্জব! বাবা বিশ্বনাথের কৃপা আছে তোমার ওপর... কী যেন নাম তোমার, হেমা?'

বেনারস!— তার মনে পড়ল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা বলছিলেন বিবিরানি। দশাশ্বমেধ ঘাট— নামটা ভীষণ শোনা, কিন্তু হোমী মেলাতে পারছিল না। সে এত দূর বেনারসে এসে পড়েছে? তাও নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে? এখানে কী করে এল, এ কথা ভাবতে চাইল না সে।

'তুমি এখানে কেন এসেছ মনে করতে পারছ? কাল রাতে তুমি কিছুই বলতে পারোনি! একটু চাঙ্গা হও, বিবিরানি চেপে ধরবে। কেন এসেছ, কার সঙ্গে এসেছ, বাড়ি কোথায়, ঠিকানা কী— সব জানতে চাইবে। এসপি, ডিএসপি সবাই বিবিরানির ভক্ত। তুমি কিছু না-বললেও দু'মিনিটে সব জেনে নেবে বিবিরানি!'

হাতের পাতা দুটো কালো হয়ে রয়েছে, পায়েও নোংরা লেগে। সে সাবান চাইল চন্দ্রার কাছে। চন্দ্রা তাকে সাবান দিয়ে বলল, 'তুমি ভাল করে জল ঢালো গায়ে। এভাবে কতক্ষণ থাকবে? আমি তোমায় তোয়ালে এনে দিচ্ছি। আমার শাড়ি ব্লাউজ তোমার হবে, কিন্তু বিবিরানি বলল, তুম আচ্ছে ঘর সে হো, আমার শাড়ি তো তোমায় দিতে পারব না! আচ্ছা, তুমি স্নান করো আমি দেখছি।'

চৌবাচ্চার ইয়া মোটা বাঁধানো পাড়ে বসে চন্দ্রার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল হোমী। চন্দ্রা ফিরল একটু পরে, 'ইয়ে ম্যায়নে কভি নেহি সোচা থা!' চন্দ্রা গালে হাত দিল।

'কী?' তার বুক দুরুদুরু করে উঠল। আর যাই হোক, কলকাতায় হোমী ফিরতে চায় না।

'বরখার জামাকাপড় তোমাকে পরতে দিতে বলল বিবিরানি! এসব এতদিন ধরাও বারণ ছিল আমাদের!' সে তাকিয়ে রইল চন্দ্রার দিকে। একটা সাদা ধবধবে কটন সালোয়ার-কামিজ তাকে এগিয়ে দিল চন্দ্রা, 'এসব বিবিরানির মেয়ের জামাকাপড়!'

'সে কোথায়?'

'মুম্বই পড়াশুনো করতে গেছিল। তারপর মায়ের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখে না!'

'কেন?'

'কারণ ওই... ওর সমাজ আলাদা হয়ে গিয়েছে। পড়াশুনো করেছে, ভাল ভাল ঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশেছে, মা'র পরিচয় তো ওকে টেনে নামাবে। বরখা এখন এই যে রিলায়ান্স আছে না, ওই কোম্পানিতে চাকরি করে। দেড় লাখ টাকা তনখোয়াহ। মাকে ওর কীসের প্রয়োজন? ওর বয়ফ্রেন্ড খুব উঁচু জাতের ছেলে। বড় ঘর। বিবিরানি সব বোঝে। মেয়েকে ভুলেও ডাকে না। তবে মনে-মনে একটা কষ্ট আছে! আমি জানি। আমাকে বিবিরানি খুব ভালবাসে। সারা মহল্লা জানে। যখন যেখানে যায়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আজ দশ বছর আমি বিবিরানির সঙ্গে আছি। সারা ভারত পাঁচবার ঘোরা হয়ে গেছে। তবে এখন তো মুজরো করা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে বিবিরানি। বেনারসের মধ্যেও কোথাও যেতে চায় না। দুটো-চারটে ফ্যামিলি আছে, যারা ডাকলে না বলে না বিবিরানি, রামগড়ের সিংদের নাতি হল, তো বড়বউ হাত ধরে সাধাসাধি করল বিবিরানিকে। 'রিয়াজ' পালন করতেই হবে! কিন্তু হেমা, বিবিরানির পরে কী হবে রিয়াজের? বেনারসেও খুঁজলে তিন কি চারজন বাইজি মিলবে কিনা সন্দেহ! তুমি যদি দেখতে বাড়ির মেয়েদের! কী আদর-সৎকার বিবিরানিকে! কী মান! বচ্চে কো গোদি মে দে দিয়া। বিবিরানি তুম পালো ইসকো! ওই আদব-কায়দা, উঠনা-ব্যয়ঠনা কে শেখাবে খানদানি ছেলেমেয়েদের? খানদানি বাইজি ছাড়া? কিন্তু তাই বলে বরখা কি এই জীবন মেনে নেবে? ওই যুগ শেষ। বিবিরানি যেদিন মণিকর্ণিকায় জ্বলে যাবে, পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে!'

'উনি হিন্দু?'

'হ্যাঁ, মানেকা বাই! ওটাই নাম।'

দাঁত মাজা হয়ে গেল হোমীর। চন্দ্রা বলল, 'হাভেলির মেয়েরা কেউ নিজেরা স্নান করে না। তাদের স্নান করিয়ে দিতে হয়। গা ডলে দিতে হয়। তোমার করে দেব?'

'এখন ক'টা বাজবে?' জানতে চাইল সে।

'বারোটা!'

বারোটা মানে এই সময় ফাঁকা মেসের সরু বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে হোমী। তার ভাত, ডাল, তরকারি মাছ টেবিলে ঢাকা দেওয়া থাকে। এই সময় অফিসে সাংবাদিক, এডিটর, প্রডিউসার, অ্যাঙ্কর, ক্যামেরাম্যান, আইটি-র লোকজন মিলে একশো জনের বেশি সমস্বরে চেঁচায়। আর সে যে এই পাথরের বাথরুমে দাঁড়িয়ে আছে এতে তার কী-ই বা নিয়ন্ত্রণ?

'কিন্তু আমি তো হাভেলির মেয়ে নই!' বলে ওঠে সে।

'হাভেলির মজা নিতে তো বাধা নেই?'

'দাও!'

'নাঙ্গি হো যাও!' চন্দ্রা বলে।

সে লজ্জা পায় না। একে একে খুলে ফেলে জিন্স, কুর্তি, ব্রা, প্যান্টি। জিনিসগুলোর ওপর জল ঢেলে দেয় চন্দ্রা। চুল খুলে এলো করে দেয়। সে বলে, 'সকালে যখন প্রথম দেখলাম তোমায়, তখনও তোমার শাড়ি ভিজে ছিল। কাউকে স্নান করাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, বড়ি মাকে। বিবিরানির দিদিমা। নব্বই বছরের বুড়ি। এখনও কী রূপ!'

'বেঁচে আছেন?'

'আর নয় তো কী? মা, দিদিমা, দিদিমার বোন সব এই বাড়িতে। শুধু বিবিরানির দিদি জাহ্নবীবাই ঘাটের পাশের হাভেলিতে থাকে। একা। মাথায় টিউমার, আর বেশি দিন বাঁচবে না। অনেক ভুগল!'

চন্দ্রা তার ঘাড়, পিঠ ডলে দেয়। ঝামা দিয়ে পা ঘষে দেয়। পিড়িতে বসিয়ে জল ঢালে মাথায়। বলে, 'আইনা সব কেচে মেলে দেবে।' নরম হাতে চুল মুছিয়ে দেয় ও। বরখার পোশাক পরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে যখন বাথরুমের ভেতরের ড্রেসিংরুমের আয়নার সামনে দাঁড়ায় হোমী, তখন নিজেকে অন্য কেউ মনে হয় তার। শুধু জীবনের গতিপথ নয়, জীবনই পালটে গেছে বলে মনে হয়!

চন্দ্রা বলে, 'তুমি কে জানি না, তবে মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন ধরে দেখছি আমাকে বলো না তোমার কী হয়েছে? কাল তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল সুস্থ নও! এখন আর তা মনে হচ্ছে না। তোমার কি ভাল লাগছে এখন একটু? ভাল লাগলেই যেখানে যাওয়ার চলে যাবে তুমি, না? কিন্তু বিবিরানি তোমাকে সহজে ছাড়বে না, দেখো।'

গোলকধাঁধা থেকে বেরোতেই নারীকণ্ঠের তান কানে ভেসে আসে হোমীর। হারমোনিয়ামের শব্দ, তানপুরার ছেড়ছাড়। সেই সঙ্গে একাধিক নারী ও পুরুষ কণ্ঠস্বর। সেসব কণ্ঠ প্রধান নারীকণ্ঠ যা গাইছে তাই অনুগমন করছে। ধ্রুপদী সংগীতের তালিম চলছে চাতাল পেরিয়ে ডান দিকে কোনও ঘরে! পাথুরে হাভেলির মধ্যে অদ্ভুত প্রাণসঞ্চার করেছে সুর। বেলা বেড়েছে বলে বেড়েছে ব্যস্ততাও। আর সবচেয়ে বড় কথা, ছাদে ওঠার সেই সিঁড়িটায় বসে আছে ছোট-বড় খান সাত-আট বাঁদর। চাতালের এক পাশে পুরনো গদি পেটাচ্ছে ধুনুরি। বাঁদরগুলো সেটাই যেন দেখছে মন দিয়ে!

সবকিছু নতুন, সবকিছু অন্য রকম, অন্য রং, অন্য গন্ধ! যেন একটা সিনেমা দেখছে হোমী।

'এত বাঁদর?'

'তুমি সাবধান, তুমি নতুন। তোমাকে খেতে দেখলে খাবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে ওরা,' বলল চন্দ্রা।

আগের ঘরটায় নয়, এবার চন্দ্রা তাকে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে অন্য ঘরে। ঘরটায় প্রায় দশ ফুট বাই দশ ফুট বড় পালঙ্ক। দেওয়াল-জোড়া আয়না। বড়-বড় উঁচু-উঁচু কাঠের আলমারি। রুপোর ট্রে-তে করে, পোর্সেলিনের কাপে চা আনছে আবার বৃদ্ধ। সঙ্গে কচুরি, জিলিপি। ঘন দুধ দিয়ে তৈরি চায়ে চুমুক দিচ্ছে হোমী। আরাম লাগছে তার। হিংয়ের গন্ধ ভুরভুর করছে আলুর তরকারিটায়। কচুরির সঙ্গে সেই তরকারি এত উপাদেয় যে স্থান কাল পাত্র ভুলে চারটে কচুরিই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে সে। চন্দ্রা হাসছে, 'খুব খিদে পেয়েছিল, না?'

'কচুরি ভীষণ ভাল খেতে!' বলে সে।

'তা হবে না? কচোরি গলির কচোরি। সারা পৃথিবীর লোক হামলে পড়ছে এখানে কচোরি খেতে। এই যে বিবিরানির কাছে এখন তালিম নিচ্ছে সাহেবমেমরা... বেরিয়েই সব কচুরি খাবে!'

সে বড় বড় চোখ করে মাথা নাড়ে, 'ও, তাই "যতন করো মন কো" এরকম শোনাচ্ছে?'

চন্দ্রাও হাসতে থাকে, 'ছ'মাস শিখে কেউ এই কলা আয়ত্ত করতে পারে? তবু হেমা, শয়ে শয়ে সাহেব মেম এসে পড়ে থাকবে বিবিরানির কাছে। আর কী নিষ্ঠা! একটা আমেরিকান ছেলে আছে, সে তো সাত পুরুষের কাশীবাসীকেও লজ্জা দেবে। ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করবে, বাবাকে পুজো দেবে। তারপর টানা রেওয়াজ করবে এখানে বসে, বিকেলের আগে উঠবে না। তার নাম ড্যানিয়েল!'

'আমার নাম হেমা নয়।'

'তা হলে?'

'হোমী! হোমী!' বলে ওঠে সে। তার আবার কেমন খারাপ খারাপ লাগে মনটা, যখন দৌড়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল সে তখন 'হোমী, হোমী' করে বারবার ডাকছিল চেতন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এত বিস্মিত ও জীবনে হয়নি!

কলকাতায় কি এখনও কিছু ঘটনা ঘটছে তাকে ঘিরে? নাকি সব ঠান্ডা! চেতনের সঙ্গে কি আবার কখনও দেখা হবে তার? এইসব ভাবছে সে, তখনই এক মহিলা ঢুকলেন ঘরে। ঠিক সম্ভ্রান্ত চেহারা নয় বিবিরানির মতো কিন্তু চন্দ্রা বা আইনার দলের কেউও নন তিনি, সেটা পরিষ্কার। হোমীকে আগাপাশতলা দেখলেন উনি। 'বরখা হি তো লাগতি হ্যায়!' কথাটা তিনি বলেন, তারপর ফিরে চলে যান।

চন্দ্রা বলে, 'কে বলো তো? বরখার ধাই। বরখাকে হাতে করে মানুষ করেছে! তোমাকে নাকি বরখার মতোই লাগছে!'

কৃতজ্ঞতা

চন্দ্রার মুখ সহজে বন্ধ হতে চায় না। ভেজা শাড়ি পালটাবার অবসর পায় না চন্দ্রা এত কথার তোড়। বিবিরানির ইতিহাস খুলে বসে হোমীর সামনে। দুপুর গড়াবার আগেই বরখার ঘরের পালঙ্কে বসে সব গল্প শুনে ফেলে সে। এ-ঘরের একটা দেওয়ালে জানলা আছে। জানলাগুলো আসলে পাথরের জাফরি ভেঙে বানানো। বাড়িটার বয়সের তুলনায় সদ্য বানানো বলা চলে। পঞ্চাশ বছর আগে হবে। জানলাগুলো খুললে যে-সরু গলিটা চোখে পড়ে সেটার নাম গঙ্গাবাই কি গলি। এই মহল্লায় আগে আরও দু'-তিনজন বিখ্যাত বাই থাকতেন। তাঁদেরই কারও নামে নাম। ভরা বর্ষায় গলিটায় গঙ্গার জল ঢুকে যায়। এই গলিটাই গিয়ে পড়েছে কচোরি গলিতে। কচোরি গলি দিয়ে সোজা মণিকর্ণিকায় গিয়ে পড়া যায়। হোমী বুঝতে পারে এই গলিরই কোথাও সারাক্ষণ ভজন গান হচ্ছে— যা সে শুনেছিল সকালে।

চন্দ্রা গল্প বলে— তিনশো বছরের বেশি সময় আগে বুন্দির কোনও রাজা স্ত্রীকে নিয়ে কাশী এসেছিলেন পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে এসেছিল সভাসদ, পাত্রমিত্র, রক্ষীবাহিনী। মানেকলাল ছিলেন তেমনই এক সভাসভ্য। তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীর আবদার রাখতে স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছিলেন কাশী। মাসখানেক সময় দিব্যি কেটে যায় কাশীতে। বাবা বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করে, পবিত্র গঙ্গায় অবগাহন করে, দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করে, ভজন-কীর্তন শুনে কেটে যায় দিন। যেদিন এখান থেকে চলে যাবেন স্থির করেছিলেন বুন্দির সেই রাজা, তার আগের দিন তাঁর ওপর ঘাতক হামলা হয়। আততায়ী ধরা পড়ে যায় ও শিরশ্ছেদের আগে জানিয়ে দেয় যে, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মানেকলালও শামিল। রাজার অনুচরদের হাতে মৃত্যু হয় মানেলালের। আর তার তরুণী স্ত্রী কমলেশ্বরী দাসীর হাত ধরে পালায়। তরুণী, গর্ভবতী কমলেশ্বরী দিশেহারা হয়ে আশ্রয়প্রার্থী হয় এক মুসলিম বাইজির। মণিকর্ণিকার এই দিকেই ছিল তখন এক বাই মহল্লা। কালে দিনে একটা মেয়ে হয় কমলেশ্বরীর। কিন্তু ততদিনে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করেছে কমলেশ্বরীকে। কমলেশ্বরীর মেয়ে রাজেশ্বরী এই বংশের প্রথম বাইজি। বংশ বলা হয়, কারণ এ হল এক নারী আধিপত্যের সমাজ। এখানে নারীর পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়।

তিনশো বছরে রাজেশ্বরী বাই-এর বংশধারা অক্ষুণ্ণ ছিল একথা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু কলার উত্তরাধিকারিণী ঠিকই জুটে গেছে। কখনও লেখাপড়া করে কন্যাসন্তান দত্তক নিয়েছে বাইরা। এই হাভেলি দুশো বছর আগে মথুরার এক দিওয়ান উপহার দিয়েছিলেন বিবিরানির কোনও এক পূর্বনারীকে। তার নাম পদ্মিনীবাই।

গল্প শুনে হোমী জানতে চাইল, 'আর পুত্রসন্তান? এদের কোনও পুত্রসন্তান হয়নি কখনও?

চন্দ্রা বলল, 'ছেলে হলে মেরে ফেলা হত। নইলে কাশীর কোনও ঘাটে দাই গিয়ে নামিয়ে রেখে আসত!'

সে চুপ করে বসে রয়েছে দেখে চন্দ্রা বলল, 'অ্যাই, এই গল্পটা আমার বানানো!'

সে বলল, 'সত্যি?'

'সবটা বানানো নয়, কিছুটা'

'তা তোমার তো বেশ ইতিহাসজ্ঞান আছে?'

'ইতিহাস জানতে হয় বড়ি-মাকে জিজ্ঞেস করো। কত রাজা-রাজড়ার গল্প ওঁর মুখস্থ। নৌকোয় চড়ে ঘাট বরাবর টহল দিক না একবার। প্রতিটা মহল, হাভেলির নাড়িনক্ষত্র সব বলে দেবে। এখনও যা স্মৃতিশক্তি! বছর তিনেক আগে ডিসকভারি থেকে একদল লোক বেনারসের ওপর ছবি তুলছিল, তারা এক মাস এ-বাড়িতেই তো ছিল। তাদের মধ্যে ছিল একজন প্রফেসর, সে বড়ি-মা'র কাছে যে কত কথা জানতে চাইত সারাদিন। এই যে হাভেলি, এই হাভেলিই তো নিখাদ ইতিহাস হোমী!'

এমন সময় খুব হুটোপাটি হল একটা। চাতাল দিয়ে দৌড়ে গেল দুটো বাঁদর। মেয়ের দল লাঠি নিয়ে তাড়া করল। চন্দ্রা বলে উঠল, 'কী নিল রে?'

কে একটা বাংলাতেই বলে দিল, 'বিস্কুটের প্যাকেট!'

হোমী বলল, 'চন্দ্রা, তোমার ইতিহাস কী?'

কোনওরকম ভণিতা না করে চন্দ্রা বলল, 'আমরা থাকতাম বাঙালিটোলায়। বাবা বই বাঁধাইয়ের কাজ করত। বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা তখন প্রায় অনাথ, না- খাওয়ার দশা। এই সময় দিদি, আমার থেকে পাঁচ বছরের বড় দিদি, বিয়ে করে নিল হঠাৎ। আমাকে দিয়ে গেল বিবিরানির দিদি জাহ্নবী বাইয়ের কাছে। সেই থেকে আমি এখানে।'

'দিয়ে গেল কেন? এমনি এমনিই দিয়ে গেল?'

'ছোটবেলায় একবার ললিতাঘাটে জাহ্নবী বাইকে স্নান করতে দেখেছিলাম আমি। সেই বয়সে এমন মুগ্ধ হই যে, বাইকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। খুঁজে খুঁজে বেড়াতাম বাইকে। কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারত না। আসলে বেনারসের খানদানি বাইরা তখন থেকেই লুকিয়ে পড়েছে মান বাঁচাতে। ডালমণ্ডির অলিতে-গলিতে, সারনাথের ওদিকে যারা নিজেদের বাইজি বলে পরিচয় দেয় তারা কারা, বাইজি পরিচয় দেওয়ার হক নেই তাদের। রাগ-রাগিণী চেনে না। আর বিবিরানিদের মতো উঁচু ঘর যাদের তারা সাহেব-সুববাদের মিউজিক টিচার হয়ে গেছে। একটা ক্লাস হাজার টাকা, কিন্তু তবু এরা জাত গোখরো। সাধারণ লোকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তুমি পাঁচ লাখ এনে রেখে দাও বিবিরানির পায়ে— বাই হাত জোড় করে বলবে, মাপ করুন, আমি ছেলেদের একটু সা রে গা মা পা শেখাই! এসব পারি না। হ্যাঁ, জাহ্নবী বাই, বিবিরানি মুজরো করবে, ফ্যামিলি দেখে, সেসব প্রাইভেট ব্যাপার— কাকপক্ষীও টের পাবে না বাই সেই আসরে কী পাল্লা গেয়ে এল, কী শাড়ি, কী গয়না পরল। যাবে, সঙ্গে নিজের জল, নিজের পানের বাটা। তাদের জলটুকুও খাবে না। গান শেষ হলে প্রতিনমস্কার সেরে গাড়িতে উঠে পড়বে। এখানে বাঘা-বাঘা পুলিশ অফিসাররা সবাই জানে বাইকে, কিন্তু সাহস হবে না বলতে— একটা তান করুন! ইজ্জত রক্ষার লড়াই। শুধু বরখার কাছ থেকেই সম্মান পেল না বিবিরানি। মা হিসেবেও না, কলাকার হিসেবেও না।

'অথচ তুমি যদি বরখার গান শুনতে। আহা— সপাট তান করবে এমন রোম খাড়া হয়ে যাবে তোমার, গলা শুকিয়ে যাবে জলতেষ্টায়! কী গায়কি, কী অদা! সারা শরীর কথা বলছে। রক্ত! রক্ত! আমি জানি, মেয়েটা

আসলে নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো যে কী কঠিন তা হোমী জানে।

'আমাকে যে দিদি বাইয়ের কাছে রেখে গেল এতে আমারই হাত ছিল,' চন্দ্রা গালে হাত দিয়ে বসে রইল, 'না, বিবিরানি কোনওদিনও এক বিন্দু সংগীতের জলও ঢালবে না আমার অঞ্জলিতে। ক্লাস যখন নেয় দেখবে বিবিরানির পাথরের মতো মুখ। বলতে পারো আমি পাগল, মেয়েরা গেরস্তি চায়, প্রেমিক চায়, সন্তান চায়— আমি এই চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম জানি না!'

'কী চেয়েছিলে?' তার কাছে পরিষ্কার হল না।

'এক-এক জনকে সময়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয় হোমী! সময়ের চেহারাটা দেখতে হয়,' বিবিরানি কেন চন্দ্রাকে এত ভালবাসে তা সহজেই অনুমেয়। চন্দ্রা বুদ্ধিমতী। আর আগুন শরীর।

'তোমাকে পুরুষরা বিরক্ত করে না?'

চন্দ্রা হাসে দুলে দুলে। বলে, 'একজন খুব করে।'

বরখার ধাই ফিরে আসে একটা ট্রে-র ওপর সিল্কের ঢাকনা দেওয়া গ্লাস বসিয়ে। তার চিবুক স্পর্শ করে ঢাকনা সরায়। কাচের গ্লাসে দুধ! না, লস্যি! ঠান্ডা! মালাই দেওয়া। বলে, 'পি লো বেটা।'

কচুরি, জিলিপি, লস্যি— সব মিলিয়ে হোমীর প্রচণ্ড অম্বল হয়ে যায়, বুকটুক জ্বলতে থাকে, দ্বিপ্রহরে একটু ক্লান্ত কিন্তু বর্ণনাতীত সুন্দর বিবিরানি ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ান বরখার ঘরের দরজায়। সে ভাবে সত্যি মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয় রূপ মানেকা বাই-এর। তার ভয় করে, ইনি যদি হাসেন, কটাক্ষ হানেন, শরীর হিন্দোলিত করেন তা হলে কী ঘটে যেতে পারে দ্রষ্টার শরীরে মনে এই আন্দাজ করে। মানেকা বাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ভেতরে আসব?'

সে পালঙ্ক ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, 'নিশ্চয়ই!'

'চলুন লাঞ্চ করে নিই,' বলেন উনি।

'আমাকে তুমি বলুন,' কোনওমতে বলে সে।

রেশমের আসনে বসে শ্বেতপাথর লাগানো পিঁড়িতে থালা রেখে খাওয়া। প্রথমে পুরি, তারপর ঘি মাখানো রুটি, তারপর ভাত, সঙ্গে পাঁচ রকম ডাল, তরকারি। সাত রকম আচার, পাঁপড়, দই ইত্যাদি। সব নিরামিষ। পেঁয়াজ রসুন বর্জিত। বিবিরানি বাঁ হাতে খান। সেই খাওয়া যেন কথকের রকমারি মুদ্রা। তারপর বরখার ঘরের পালঙ্কে তাকে নিয়ে এসে বসেন উনি। চন্দ্রাকে সরে যেতে বলেন। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস, বাট ইফ ইউ উইশ টু টেল. . . ।'

সে মাথা নিচু করে থাকে, সে জানে, বোঝে, তার বলার কিছু নেই। বুন্দির রাজার রক্ষীরা তাড়া করলে কমলেশ্বরীর পালানোর যে-যৌক্তিকতা তৈরি হয়, মুসলমান বাই-এর আশ্রয় নেওয়ার যে-যুক্তিগ্রাহ্য গল্প তৈরি হয়, তার মতো মর্মস্পর্শী কোনও ঘটনা নেই তার জীবনে। সে স্বাধীন একটা মেয়ে, কেউ তাকে কখনও কোনও ব্যাপারে বাধা দেয়নি। এমনকী সম্পর্কও সে ইচ্ছেমতো ভেঙেছে গড়েছে। একটা ট্রেন বা প্লেন ধরে বেনারস সে এমনিই আসতে পারত। তবু এই যে সে তাড়া খেয়ে নিজের সম্পূর্ণ অজান্তে এখানে এসে পড়েছে সেটাও সত্যি! ভীষণ সত্যি!

'তোমাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' জানতে চান বিবিরানি।

সে মাথা নাড়ে, 'এক রাত আশ্রয় দিয়েছেন, সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করেছেন, এত যত্ন অচেনা কাউকে করেছেন! আমার আর কোনও সাহায্য চাই না।'

বিবিরানি চুপ করে তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে, 'পুলিশের সাহায্যও চাই না?' একটা চুমকি বসানো বটুয়া থেকে স্টিল ফ্রেমের চশমা বের করে চোখে পরেন মহিলা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান উনি। সে আবারও চুপ করে থাকে। বিবিরানি বলেন, 'আমি পাসপোর্ট দেখতে চাই আমার কাছে যারা আসে তাদের। বহু বছর ধরে এই পদ্ধতিতে আমি বিদেশিদের জাজ করে আসছি। তোমার কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া যায় না। তুমি তো আমার কাছে আসোনি। তুমি চন্দ্রার হাত ধরেছিলে। চন্দ্রা তোমাকে আমার কাছে এনেছে, ও তোমাকে বিশ্বাস করেছে। আর তা ছাড়া তোমার ব্যাগট্যাগ সব হারিয়ে গেছে। কী দেখতে চাইব!'

'সব হারিয়ে যাওয়াটা যে কী ভাল। কী মুক্তি!' বলে সে।

'তুমি কি তোমার পরিচয় নিয়ে খুশি নও?' যেন একটা খুব বড় প্রশ্ন, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এভাবে কথাটা বলে ওঠেন মহিলা।

'আমরা যারা কোনওদিন কোনও ধর্মে বিশ্বাস রাখিনি, আমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, নিয়তিতে বিশ্বাস করি না, যারা জানি, জেনেছি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় গড়ে ওঠে তার, যদি হঠাৎ একদিন দেখি যে, জীবনে আসলে কোনও পৃথক অভিজ্ঞতাই নেই, ঘটনা নেই, সবই নির্দিষ্ট, সম্পর্ক নির্দিষ্ট, দুঃখ নির্দিষ্ট, সুখ নির্দিষ্ট তা হলে আর আত্মপরিচয়ের জন্য কি মমতা থাকতে পারে বিবিরানি? শুনুন বিবিরানি, নিয়তি আমাকে তাড়া করেছে। নিয়তিকে বাদ রেখে এক মুহূর্ত যদি নিজেকে দেখতে পাই— একটা ঝলক, একটা অকৃত্রিম ঝলক— ' সে আর কথা খুঁজে পায় না, অসহায়ের মতো কথা হাতড়াতে থাকে হোমী।

'তা হলেই জানবে তুমি আছ। তুমি ছিলে। তুমি আছ? তুমি! তুমি! ইউ! ইউ আর দেয়ার!'

'হ্যাঁ! ঠিক, ঠিক! হ্যাঁ— আমি তো আছি! আমি নেই হয়ে যাচ্ছি কেন ক্রমাগত?'

বিবিরানি বললেন, 'তোমাকে দিনানাথ পাঠকের কাছে নিয়ে যাব সন্ধেবেলা। তুমি ওঁকে প্রশ্ন কোরো।'

'দিনানাথ পাঠক কে?'

'লোকে জানে দিনানাথ পাঠক বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ! অব্যর্থ গণতকার। কিন্তু কারও হাত দেখা, ভাগ্যফল গণনা করা এসব জ্যোতিষচর্চা উনি বহু যুগ আগে ত্যাগ করেছেন। আর এখন উনি মৃত্যুশয্যায়। তবু তোমাকে দেখে যদি ওঁর কিছু বলার ইচ্ছে হয় উনি বলবেন। ওঁর দেখা পাওয়া যায় না— সাধারণ লোক ওকে দেখতে পায় না। আমার অবশ্য ওঁর পরিবারে যাতায়াত আছে।'

সন্ধে নামার অনেক আগেই এই হাভেলির সব ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। গলিগুলো এমনিই অন্ধকার। সূর্যালোক দিনের বেলায়ও ঢোকে না। হোমী আর বিবিরানি যখন কথা বলছিল তখন দুপুরে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয়ে গেছিল ভজন। একটু পরে যেন চারিদিক থেকেই ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল ঢং, ঢং, ঢং! তারপর কাঁসরের শব্দ! ক্রমশ কথা ফুরোল তাদের। ঘণ্টাধ্বনি, কাঁসরের আওয়াজে অন্ধকার ঘরে বসে ঝিম ধরে গেল হোমীর শরীরে। তার এত আরাম হতে লাগল, মনে হল এত শান্তি পাচ্ছে সে, এমন এক নতুন অনুভূতির জগতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যার কোনও তুলনা নেই!

চন্দ্রা এল চা নিয়ে এবার, ওর দু'হাত ভরতি চুড়ির শব্দও কী মোলায়েম! বিবিরানি অস্ফুটে বললেন, 'ড্যানিয়েল আসবে। ওকে কাল আসতে বলে দিস। হোমীকে নিয়ে আমি পাঠকজির কাছে যাব!'

চন্দ্রা অন্ধকারেই এগিয়ে এসে তার কানের ভেতর মুখ ডোবাল, ফিসফিস করে বলে উঠল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না!'

বিবিরানি শুনতে পেলেন সেটা, 'অন্যকে কাছে টানার এই কি নেশা তোর চন্দ্রা?'

সে বলে উঠল, 'বিবিরানি, আমাকে আপনার কাছে কিছুদিন থাকতে দিন!'

এখানে কেন?

গলি দিয়ে গলি দিয়ে তাকে নিয়ে চললেন বিবিরানি দিনানাথ পাঠকজির বাড়ি। চন্দ্রা চলল আগে আগে। যেখানেই যায় ঘণ্টা বাজছে। কাঁসর বাজছে। ছোট বড় মন্দির। গাছের কোটরেও মন্দির। আর এত উঁচু-নিচু, জল কাদা মাখা সরু সরু গলি যে, মনে হয় এ যেন এক গোপনীয়তার সংস্কৃতি! এ যেন গোপনীয়তার শহর! বস্তুত মানুষ যত পুণ্য অর্জন করতে চায়, যত মনস্কাম সফল হোক চায় ততই তো সে অন্তরাল চায়, সংগুপ্তি চায়!

এদিকে যত সরু গলি ধর্মের ষাঁড়গুলো ততই বৃহৎ! সে ভয় পেলে চন্দ্রা হাসতে থাকে। বিবিরানি বলেন, 'হাসির কী কারণ আছে?'

এক জায়গায় চেয়ার-টেয়ার পেতে বসে আছে অনেক পুলিশ। এইখানে চন্দ্রা ও বিবিরানি দাঁড়ায়, জুতো খোলে এবং গলিটার উদ্দেশে প্রণাম করে। চন্দ্রা বলে, 'এটা বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের পেছন দিকটা!'

এর পরই তারা বেঁকে যায় ডান হাতের একটা গলিতে। বিবিরানিদের কথোপকথন থেকে হোমী বোঝে কুঞ্জগলির মুখটায় দিনানাথজিদের কতশত বছরের পুরনো হাভেলি। এই গলিটাও ক্রমশ সরু হতে হতে শেষে চার-পাঁচ হাত দাঁড়ায়। এবং একের পর এক মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ছুটে যায় আটজন-দশজনের এক একটা দল। সে বোঝে, মৃতদেহগুলো মণিকর্ণিকার দিকে যাচ্ছে। সেই মণিকর্ণিকার শ্মশান যেখানে বহু হাজার বছরে কখনও চিতার আগুন নেভেনি! বিবিরানি ফিনফিনে সিল্কের চাদর দিয়ে ঘোমটা টেনেছেন। সবাই তাঁর দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে। কিন্তু তিনি কাউকেই বিন্দুমাত্র লক্ষ করছেন না, কেমন ঘোরের মধ্যে হাঁটছেন যেন। আর হোমী ভাবছে তিনজনে চলেছে, কিন্তু এ যাত্রা একা তার!

যেন একটা পোড়ো বাড়ির গর্ভগৃহ— প্রায় অন্ধকার, জানলা নেই। আর তারই এক কোণে লাল কম্বল দিয়ে আবৃত শরীর, একটা চৌপায়ার ওপর শুয়ে আছে কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ। বয়সের গাছপাথর নেই! বাটি আর চামচে করে সেই বৃদ্ধকে একটু একটু করে জল খাইয়ে দিলেন বিবিরানি, 'কম্বল সরিয়ে চরণসেবা করো ওঁর!' তাকে বললেন বিবিরানি। আর এইটা করতে সে ভয় পেল! কী ভীষণ ভয়! তার দুটো হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল! চোখ থেকে জল পড়তে লাগল! কেমন এক আতঙ্কে ঘেমেনেয়ে উঠল সে। বিবিরানি বললেন, 'অবাধ্য হয়ো না, যা বলছি করো!'

সে বলল, 'আমি পারব না! আমি পারব না!'

'ছিঃ!' বলে উঠলেন বিবিরানি, 'এ তুমি কী করলে হোমী?'

দিনানাথ পাঠক কথা বলে উঠলেন, 'ও পারবে না! উসসে নহি হোগা!'

বিবিরানি বললেন, 'ও কেন এসেছে এখানে বাবা?'

'কোথায়?'

'এই বেনারসে?'

‘সেটাই উত্তর! বেনারসে পৌঁছোনোটাই উত্তর!’

‘আর কিছু বলবেন না ওকে দিনানাথজি?’

উনি ইশারা করলেন একটা। বিবিরানি বললেন, ‘উনি তোমাকে কিছু লিখতে বলছেন হোমী! উনি তোমাকে একটিমাত্র শব্দ লিখতে বলছেন!’

একটা মাত্র শব্দ! কী সেই শব্দ যা সে লিখবেই এক্ষুনি? যা সে লিখবেই বলে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কী সেই শব্দ যা তাকে প্রমাণ করবে? একটা, একটা শব্দের খোঁজে কি সে তোলপাড় করে ফেলবে জীবন? বিভিন্ন ভাষায় যত শব্দ সে জানে চেনে— প্লেন থেকে দেখতে পাওয়া রাতের হাইওয়ের আলোর স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছে সেই শব্দস্রোত আর সে তার থেকে একটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে! একটা শব্দ— সে আত্মস্থ হতে পারছে না! ঘূর্ণাবাত্যায় পড়েছে যেন চেন ফ্ল্যাগ— সে একটা চরম শব্দ খুঁজছে তেমনই রুদ্ধশ্বাসে! নিজেকে নিজে জীর্ণ করে ফেলছে হোমী এত বড় যুদ্ধ যেন তা। ঘরে একটা কুলুঙ্গি মতো, তাতে কাগজ আর কলম রাখা। বিবিরানি দেখিয়ে দিলে সে তুলে নেয় সেই কলম ও কাগজ। তারপর বড় বড় করে সেই মোক্ষম শব্দটা লেখে সে। Confinement!

একান্তে, নিবিড় করে নিজেকে দেখতে পায় হোমী এই শব্দটার মধ্যে। বিবিরানিকে কাগজটা দেয় সে, বিবিরানি সেটা দিননাথজির চোখের সামনে মেলে ধরেন। বৃদ্ধ কষ্ট করে পড়ে দেখেন সেটা। বলে ওঠেন, ‘হে কৃষ্ণ! হে কঠোর!’

হোমীর বিহার

দুপুরে খেয়ে অম্বল হয়েছিল বলে হোমী রাতে চন্দ্রার জোরাজুরি সত্ত্বেও কিছু খেল না, দিনানাথজির কাছ থেকে ফেরার পথে তার সঙ্গে বিবিরানি একটাও কথা বলেননি। চোখমুখ থমথম করছে, তবু তাঁর স্নিগ্ধতা তিনি বজায় রেখেছেন। পচা শালপাতায় পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হোমী ধরে নেয় তাঁকে। 'থ্যাঙ্কস,' বলেন তিনি। হাভেলিতে ফিরে যে ঘরে বসে তিনি রেওয়াজ করেন, ছাত্রছাত্রী তালিম দেন, সেই ঘরে চলে যান একটাও বাক্য ব্যয় না-করে। চন্দ্রা দিনানাথজির ঘরে ঢোকেনি ফলে ও হোমীর কাছে জানতে চায় কী হয়েছে। সে দ্বিধার সঙ্গে জানায়, 'সম্ভবত দিননাথজির চরণসেবা না-করতে চাওয়াই বিবিরানির রাগের কারণ!'

চন্দ্রার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, 'সে কী? তুমি কেন এমন করলে? তুমি জানো না উনি কে! বিবিরানি তোমাকে ক্ষমা করবে না। হে ঈশ্বর!'

'আমার ভয় করছিল! ভীষণ ভয়!'

'কীসের ভয়?' সে চুপ করে থাকে। চন্দ্রা বলে, 'কীসের ভয় বলো?'

সে বলতে পারে না।

'তোমার মাথার দোষ আছে! দিল্লির নেতারা ওঁর একবার দর্শন পাওয়ার জন্য কী করে তুমি জানো? হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে!'

এই সময় চাতালের ওপাশ থেকে তানপুরার শব্দ ভেসে আসে। চন্দ্রা বলে, 'জানি না তোমার কপালে কী আছে, দাঁড়াও, আমি আসছি!'

একটু পরেই ফিরে আসে চন্দ্রা, 'এই টাকাটা রাখো হোমী।' দুশো টাকা। সব পঞ্চাশ টাকার নোট। তার ব্রা আর প্যান্টি অল্প ভিজে অবস্থাতেই পরে নিয়েছিল সে সন্ধেবেলা। জিন্স আর কুর্তি চন্দ্রা তাকে ফেরত দিয়ে দিল, 'তোমার জামাকাপড় পরে নাও। যে-কোনও মুহূর্তে তোমাকে বিবিরানি চলে যেতে বলতে পারে। আমার তখন কিছু করার থাকবে না। এরা জাতসাপ। উসুলের বাইরে বেরোতে পারে না। তুমি অন্যায় করেছ ওঁর নির্দেশ অমান্য করে, দিনানাথজিকে অসম্মান করেছ— তুমহারি খ্যয়ের নেহি।'

হোমী দত্ত নাকি হোমী বাসু, যাই হোক, আজ রাতটা কলকাতার কোনও নাইট ক্লাবে ঝংকার বিট্‌সের সঙ্গে কোমর দোলাতে পারত! বদলে সে বিবিরানির পাথরের হাভেলিতে কপর্দকশূন্য হয়ে বসে বসে ভাবছে অসন্তুষ্ট বিবিরানি এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলবে কি না! এসব অ্যাক্সিডেন্টালি ঘটেনি। সে নিজেই নিজেকে ঠেলে ঠেলে এখানে এনে ফেলেছে। এ কথাই বা ঠিক কিনা কে বলতে পারে? পিয়োর অ্যাক্সিডেন্ট আর আত্মকর্ম যদিও এক নয় তবু দুটোই নিয়তি। সমস্ত ঘটনার পরিণামে আজ রাতে তার এই যে অপেক্ষা— এ তো নির্দিষ্টই ছিল!

সে নিজের পোশাক পরে বিবিরানির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল বরখার পালঙ্কে বসে। চন্দ্রাও বসে রইল কাছে। ধীরে ধীরে হাভেলি নিঝুম হয়ে এল। সব ঘরগুলোয় নিভে গেল আলো। শুধু জ্বলতে লাগল চাতালের

বাল্বটা। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল চন্দ্রা। বিবিরানি কোনও গান ধরেননি। শুধু তানপুরা বাজছে। এভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেছে জানা নেই। একসময় সে দেখল বিবিরানি তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, 'তুমি ওঁকে প্রণাম করতে অরাজি হলে কেন?'

সে বলল, 'বিবিরানি, আমার হাতে লেখা নেই, অন্যকে স্বীকার করা লেখা নেই! শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার এইসব রেখা মুছে গেছে! কিংবা ছিলই না কখনও! বিশ্বাস করুন!'

'ইস, তোমার কী কষ্ট হোমী! কী কষ্ট তোমার!' বলে উঠলেন বিবিরানি, দীর্ঘশ্বাস স্পর্শ করল তাকে, 'এরকম জীবন বহন করা কী কঠিন, তাই না?'

এর কী-ই বা উত্তর হয়?

'চন্দ্রা, ওকে মশারির ভেতর শুইয়ে দে!' বললেন উনি।

চন্দ্রা জেগে গেছিল, আলমারি খুলে বের করে আনল মশারি।

'শুয়ে পড়া হোমী, তার আগে পোশাক পরিবর্তন করে নাও!' বলে ধীরে-সুস্থে স্থান ত্যাগ করলেন মানেকা বাই!

চন্দ্রা শুয়েছিল তার পাশেই। শুয়ে পড়ার পরও হোমীর ঘুম আসছিল না! বারবার মনে হতে লাগল তার মাথার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে!

ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সম্ভবত। কিন্তু চন্দ্রা ডেকে দিল তাকে। চন্দ্রার তৎপরতা ভোর থেকেই শুরু হয়ে যায়। কাকভোরে উঠে ও ললিতাঘাটে গঙ্গাস্নানে যায়। ফিরে বিবিরানিকে, মাজি ও বড়িমাজিকে স্নান করায়, স্নান সেরে বিবিরানি রেওয়াজে বসেন। কোনও কোনওদিন মাজিও! আজ ঘুম থেকে নিজে উঠে পড়েই ও হোমীকে ডাকল, 'চলো, চলো, ওঠো! ঘাটে যাবে চলো আমার সঙ্গে? খুব ভাল লাগবে! স্নান করবে!'

সে বলল, 'না, আমি গঙ্গায় স্নান করব না!'

চন্দ্রা বলল, 'কেন? কী ক্ষতি হবে শুনি? বিবিরানি ভি গঙ্গামে নহাতি হ্যায়। এই নাও সালোয়ার-কামিজ। পরো, মুখেচোখে জল দাও। তারপর চলো। ভোরবেলা মা গঙ্গার দর্শন করে আসবে। তুমি যে কত বড় নাস্তিক, তা আমার বুঝতে বাকি নেই! সে যাই হোক, ভগবান বিশ্বাস থাক বা না-থাক— এ দেখবার মতো দৃশ্য!'

'তুমি গঙ্গাস্নান করছ, এ তো দেখবার মতো দৃশ্যই চন্দ্রা!' বলল সে

চন্দ্রা রেগে গেল, 'আমাকে দেখার কথা হচ্ছে না! উফ, ভীষণ জেদি তুমি। সব ব্যাপারে জেদ!'

'একদিনেই আমাকে তুমি চিনে গেছ চন্দ্রা?' বলে ওঠে হোমী।

কাল অনেক রাত অবধি অবিরাম বাজছে ঘণ্টা— কান পেতে শুনেছিল হোমী। তারপর কখন থেমে গেছিল টের পায়নি। ভোরেই আবার এখানকার বাতাসকে মন্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ঘণ্টার ধ্বনি, ভজনের সুর, কথা! সে ঠিক করল যাবে, চন্দ্রার সঙ্গে ঘাটে যাবে তবে স্নান করবে না! খাট থেকে নেমে কী খেয়ালে হোমী এগিয়ে গেল গলির দিকের জানলায়। শিক ধরে দাঁড়াল!

নোংরা ভেজা গলি। দু'পাশে ঠাসাঠাসি বাড়ি। প্রাচীন বাড়ি সব। নীচেই একটা হনুমানজির মন্দির, লোহার শিকে মাথা ঠেকিয়ে সে এসব দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এবং আধ মিনিটও কেটেছে কি কাটেনি সে দেখল

দু'জন সাধু! কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে। প্রথমেই ধক্ করে উঠেছিল বুকটা তার, কিন্তু সাধু দু'জনের কারও মাথায় জটা নেই শুধু গৈরিক পাগড়ি বাঁধা। নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ল একজনের। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সাধুটা, তার দেখাদেখি অন্যজনও দাঁড়িয়ে গেল, 'এ বাচ্চা, চায় পিলা বাচ্চা, মহাত্মা কা সেবা কর বাচ্চা!'

সাধু দু'জনই বেশ বয়স্ক। কণ্ঠস্বর জোরালো, সূক্ষ্মতা হীন বক্তা সাধুর। তার মনে পড়ল সেই 'মহারানি' ডাক! ধ্যানমগ্ন কণ্ঠস্বর। কামজর্জর! তার নিয়তি সচারুরূপে ভয়ংকর। এরা দশাসই দু'জন সাধু মাত্র! হাতে ত্রিশূল ছোট ছোট, তার মুখে কমণ্ডলু ঝুলছে!

'ভুখে হ্যায় বেটা হামলোগ!'

'এত সুবহা সুবহা কোথায় খাবার পাব, মাফ করো মহারাজ!' তার পাশ থেকে বলে দিল চন্দ্রা!

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চন্দ্রার হাতে একটা চটের ব্যাগ। তাতে ওর গামছা, শাড়ি। এত ভোরেও রাস্তায় ম-ম করছে ঘিয়ের গন্ধ। চন্দ্রা বলল কচুরি জিলিপি ভাজা শুরু হয়ে গেছে। গঙ্গাস্নান সেরে, বাবা বিশ্বনাথকে ফুল চড়িয়েই বেনারসের মানুষ কচুরি, জিলিপি খায়।

সে হঠাৎ বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়েছিল চন্দ্রা?'

'ওটাকে দেখা হওয়া বলে? তোমার চোখে তখন দৃষ্টি ছিল হোমী? অঝোরে জল পড়ছে চোখ দিয়ে, উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে! এত বড় একটা শরীর, আমি কীভাবে টানতে টানতে নিয়ে গেছি তোমাকে হাভেলি — তা আমিই জানি। আমার তো পরশু সন্ধেবেলা দশাশ্বমেধ যাওয়ার কথাই নয়। শুনলাম, এলাহাবাদের জয়ন্ত মিশ্র এসেছেন, দু'দিন থাকবেন। এই দু'দিন উনিও গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করবেন, তাই শুনব বলে এসেছিলাম! না এলে কী হত?'

'তোমাকে আসতেই হত চন্দ্রা!' বলল হোমী।

চন্দ্রা বলল, 'চলো তা হলে, দশাশ্বমেধেই যাই। আসলে ওখানে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই থিকথিকে ভিড়!'

কত শত ছবিতে, সিনেমায় এই ঘাটকে দেখেছে হোমী, আজ সামনে থেকে দেখল প্রথমবার। অনেকদিন হয়ে গেছে নিজের নিয়তিকে ছাড়া সে আর কাউকে বিশ্বাস করে না! কিছুকে না! একসময় সে ভেবেছিল নিয়তি তাকে অনুসরণ করছে, আজ তার মনে হচ্ছে সে নিজেই অনুসরণ করছে না তো নিয়তিকে! দিনানাথজি বলেছেন 'বেনারসই উত্তর!' ঠিক বলেছেন উনি। বেনারসই উত্তর! এখানে সব আছে— দেখতে পাচ্ছে সে। আত্মসমর্পণের প্রতিটা পন্থা সক্রিয় হয়ে আছে এখানে!

চন্দ্রা তাকে ব্যাগটা ধরতে দিয়ে নেমে গেল জলে। দু'হাতে জল সরাল প্রথমে। তারপর ডুব দিতে লাগল বারবার। সে জল আর মোটা পলি মাখা সিঁড়িতেই বসে পড়ল। ঘাটে তক্তাপোশের ওপর চাটাই পেতে ছাতার নীচে বসে আছে তিলক কাটার টিকিধারী ব্রাহ্মণরা। তারা ডাকাডাকি করতে লাগল তাকে। জানতে চাইল সে স্নান করবে কিনা!

বাঁ হাতে জলের ওপর ভেসে আছে একটা গোলাকার চাতাল। তার ওপর বসে একদল সাধুবাবা। ছিলিম টানছে এত ভোরেই! যেদিকে তাকাবে সেদিকেই যোগী পুরুষ, গৈরিকবস্ত্রধারী! এই সাধুদের ভিড়ে হোমীর

চোখ 'তাকেই' খুঁজছে। একসময় খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে গেল সে। নিশ্চিত হল, না লোকটা তাকে আর ধাওয়া করছে না। তার মনে পড়ল, লোকটাকে সে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছিল! হয়তো সত্যিই হোমী মুক্ত এখন। হয়তো আর কখনও দেখতে পাবে না সে নিজের নিয়তিকে।

চন্দ্রা ফিরে এলে হোমী বলল, 'চন্দ্রা, তুমি যে-টাকাটা আমাকে দিয়েছিলে সেই টাকাটা আমি সঙ্গে এনেছি, সেটা দিয়ে কি কলকাতায় ফোন করতে পারি?'

'হাভেলি চলো, বিবিরানি তোমাকে কথা বলিয়ে দেবেন!'

'বেশ, তাই চলো!' বলল সে।

'বিকেলে আরতি দেখতে আসবে হোমী?' বলল চন্দ্রা।

'আসব!'

দুটো টাকা দিয়ে চন্দন আর সিঁদুরের টিপ পরল চন্দ্রা! ঝলমল করে উঠল ওর মুখটা। তারা দু'জনে বাড়ির পথ ধরল, একটু এগোতে একজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে দেখা হল চন্দ্রার। চন্দ্রা টিপ করে প্রণাম করল প্রৌঢ়কে। দুটো বাক্য বিনিময়ের পর আবার চলতে শুরু করল তারা। চন্দ্রা বলল, 'ইনি কে জানো হোমী? সিদ্ধপুরুষ, দেখলে বোঝা যাবে না— অনেক রকম ক্ষমতা ওঁর! কালীভক্ত! মন্ত্র পড়ে অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। একবার ছোটবেলায় আমার জন্ডিস হয়েছিল। আমাকে কী একটা খেতে দিল গুঁড়ো গুঁড়ো মতো। তারপর বললেন, আমি মন্ত্র পড়ছি, তুই এই গামলার জলে ঘষে ঘষে হাত ধো! বিশ্বাস করো হোমী, যত হাত ধুতে লাগলাম গামলার জল তত হলুদ হতে লাগল। সে দেখার মতো ব্যাপার। তারপর আমার কান থেকে, নাক থেকে বের করে আনলেন হলুদ রঙের গুঁড়ো!'

'তুমি সেরে গেলে?' হোমীর হাসি পেল না।

'সময় লেগেছিল। কিন্তু সেরে গেলাম,' বলল চন্দ্রা।

হাভেলিতে ফিরে ফোনের কথা বলতেই বিবিরানি বললেন, 'খুব ভাল কথা, এখুনি ফোন করো!' তখন আটটাও বাজেনি, বিবিরানির শয্যাকক্ষে মখমলে মোড়া একটা সোফায় বসে মাকে ফোন করল হোমী। মা তার গলা পেয়েই ফেটে পড়ল রাগে, 'যেখানে আছ, এক্ষুনি ফিরে এসো সেখান থেকে খুকু! অসুস্থ বাবা-মাকে ফেলে তুমি পালিয়ে গেলে? জানো, সেদিন একা-একা দাঁত তুলিয়ে ফেরার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম? মিতার সঙ্গে বেড়াতে যাব বলেছিলাম বলে তোমারও অমনি বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হল? অলি পর্যন্ত চিন্তা করছে তোমার জন্য!'

মা'র ফোন কেটে দিয়ে সে যশকে খুঁজল অফিসে। যশ ন'টার আগে যে আসে না ভুলে গেছিল হোমী। যশের জন্য মেসেজ ছেড়ে দিল সে। বিবিরানির নম্বরটা দিয়ে দিল। ন'টা বাজতে না-বাজতেই ফোন এল যশের, বিবিরানি আইনাকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন, 'কোথায় তুমি?' বলে উঠল যশ, গলায় একরাশ উৎকণ্ঠা।

'আমি বেনারসে!'

'কীভাবে?'

'জাস্ট চলে এসেছি!'

‘হোমী তুমি চেতনকে একবার ফোন করো! তুমি ওকে যথেষ্ট ভুগিয়েছ। আমার আর কিছু বলার নেই তোমাকে। চাকরিটা যদি রাখতে চাও ওখান থেকে ই-মেলে একটা ছুটির দরখাস্ত করে দাও!’

‘যশ, তিন দিন হল আমার ব্যাগ, ফোন সব হারিয়ে গেছে কিন্তু সিমটা লক পর্যন্ত করানো হয়নি!’

‘বেনারসে এখন টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি কত বেড়ে গেছে জানো? সিমটা কার না-কার হাতে গিয়ে পড়বে! যেভাবে চলছ হোমী, তাতে নিজেকে ডুবিয়ে ছাড়বে! এসবের কোনও ব্যাখ্যা হয়?’

‘আমি খুব শিগগিরি ফিরে যাব যশ!’

‘টাকাপয়সা চাই?’

সে চুপ করে থাকল একটু, ‘আমি জানাব!’

‘তার মানেই তোমার অন্য কোনও প্ল্যান আছে!’

চেতনের নম্বরটা নিয়ে ফোন ছেড়ে দিল হোমী। বিবিরানিকে জিজ্ঞেস করে চেতনের নম্বর ঘোরাল, ‘চেতন, আমি হোমী!’

‘তুমি! ও!’ চেতনের গলাতেও রাগ, ‘না, হোমী, তুমি যা করেছ আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না! তুমি আমাকে যে বিপদে ফেলেছিলে সেদিন। তোমার মেসের খোলা দরজার সামনে সারারাত আমি দাঁড়িয়ে। অত রাতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লে, তারপর কোথায় গেলে কেউ জানে না। আমি অফিসে ফোন করছি, তুমি অফিসে গেছ কিনা! সবাই জানে তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে! সবাই আমাকে কোয়েশ্চেন করছে! একটা টোটালি অ্যাবসার্ড সিচুয়েশন! শেষে তোমার মেসের মেয়েদের ডেকে তুলতে বাধ্য হই! এখন তোমার মা, ওই মেয়েরা, অফিসের সবাই আমার কাছে তোমার খবর জানতে চাইছে। তোমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হতে যাচ্ছিল হোমী আমার— থ্যাঙ্ক গড যে সেটা হয়নি!’

সন্ধেবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গা আরতি দেখবে বলে বের হচ্ছে সে আর চন্দ্রা, এই সময় ড্যানিয়েল এল! চন্দ্রা আর ড্যানিয়েলের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ঘটল একটা— ড্যানিয়েল বিবিরানির কাছে গিয়ে দু’মিনিট পরেই ফিরে এল, তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি কি আপনাদের সঙ্গে আসতে পারি?’ উচ্চারণ যেমনই হোক ড্যানিয়েলের হিন্দি খারাপ নয়! হোমী চন্দ্রাকে দেখছিল— একটা হলুদ জর্জেট। তেমনই সরু স্লিভলেস ব্লাউজ! চুড়ো করে বাঁধা চুল।

ড্যানিয়েল আর চন্দ্রা যে পরস্পরকে পছন্দ করতে শুরু করেছে এর যথার্থ কারণ একটাই— তা হল নিয়তি। ঠিক যেমন বলেছিলেন মি. বেদ তাকে, কনসিকোয়েন্স! ড্যানিয়েল এসেছে সুদূর ডেট্রয়েট থেকে। বিবিরানির কাছে ধ্রুপদী সংগীত শিখতে পা দিয়েছে হাভেলিতে। চন্দ্রা সেই বাড়িরই মেয়ের মতো। বিবিরানির ব্যক্তিগত অ্যাটেনডেন্ট। সুন্দরী, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিমতী! উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠছে প্রেম— সম্ভবত! অথবা ভাল লাগাও বলা যেতে পারে। এগুলো কতগুলো সিচুয়েশনের অতিরিক্ত কিছু নয়। সত্যি সত্যিই কি প্রেম বিশেষ কতগুলো পরিস্থিতির উৎপাদক নয়? প্রেমিক-প্রেমিকা মানে কি একই পরিস্থিতির শিকার দু’জন মানুষ নয়?

দশাশ্বমেধ ঘাটে তিলমাত্র জায়গা খালি নেই। যারা কাছ থেকে আরতি দেখতে চায় তারা বিকেল থেকে ঘাটের বড় বড় সিঁড়ি, রোয়াকের দখল নিয়ে নেয়। পাশের মন্দিরের উঁচু ঘেরা চাতালটা যেন সাহেব-মেমদের জন্য সংরক্ষিত। ঘাটের উপর অজস্র নৌকায় চড়ে বসে আছে মানুষ, আরতি দেখবে। ছ’টা অল্প বয়সি ছেলে সাদা

সিল্কের ধুতি আর কমলা সিল্কের জামা গায় দিয়ে বড় বড় পেতলের সহস্র প্রদীপের মাথাচাড়া দেওয়া আগুনের শিখা ও তাপ অগ্রাহ্য করে শুরু করল গঙ্গা আরতি। ঘাটেরই এক কোণে গাইয়েদের বসার ব্যবস্থা। বড় বড় ফ্লাড লাইটকে অনুজ্জ্বল করে দিল ছ'টা ছেলের হাতের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড!

দশাশ্বমেধের ঘাটে দাঁড়িয়ে সব ভাল করে দেখা যাচ্ছে না বলে চন্দ্রা তাদের নিয়ে চলল পাশের ঘাটটায়। এবার সত্যিই সব ভাল করে দেখতে পেল সে। দেখতে দেখতে তার মনে হল ভারতবর্ষ এক ছেলেমানুষদের দেশ। সেই ছেলেমানুষরা কোনওদিনও বড় হবে না! ছোটবেলায় পাউডার জলে গুলে সে পুতুলের দুধ তৈরি করত। এখানে এই ঘাটে ভোর থেকে রাত অবদি সব মানুষই সেরকম কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে যেন, কখনও সিঁদূর গুলছে, কখনও চন্দন বাটছে। এক-একটা বেল পাতায় চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছে, ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ঝুড়িতে রাখছে, সেটাকেই মন্ত্র বলে জলে ফেলছে, কখনও তিন ডুব দিচ্ছে, কখনও ডুব দিতে দিতে ঘুরছে, কখনও দুধে জল মিশিয়ে ফেলছে, কেউ বলছে তিনটে ধাতুর মুদ্রা মাথার পেছন দিয়ে গড়িয়ে দিন, কেউ বলছে একশো আটটা প্রদীপ জ্বালান, কেউ বলছে হরীতকী আর তুলসী পাতা মুঠোয় ধরে গলা জলে দাঁড়িয়ে...

খেলা! খেলা। খেলা! অতিকায় এক ভারতের ঈশ্বরের সঙ্গে খেলায় মেতে আছে সবাই!

ড্যানিয়েল আর চন্দ্রা খুব কাছাকাছি বসে আছে এখন! ড্যানিয়েল আলতো হাতে ছুঁয়ে আছে চন্দ্রার কাঁধ। ফ্লাড লাইটের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছে চন্দ্রাকে। ড্যানিয়েলও সুন্দর যুবক তবু চন্দ্রার উদ্ভিন্নযৌবনের কাছে ম্লান। কিছুক্ষণ ওরা দু'জনেই আরতিতে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। হোমী সরে যেতেই ওরা পরস্পরকে ছাড়া আর কিছু দেখছে না। হয়তো হোমী না-থাকলে চন্দ্রার সঙ্গে ঘাটে আসার কথা কখনও বিবিরানির সামনে উচ্চারণ করতে পারত না ড্যানিয়েল। হয়তো তা আদৌ নয়। চন্দ্রা স্বাধীনভাবে বিচরণে সক্ষম সর্বত্র। বিবিরানি ওকে কিছু বেঁধে রাখেননি, হতে পারে ওরা নিয়মিতই কোনও না কোনও প্রাচীন ঘাটের সোপানে বসে অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া জলকে সাক্ষী রেখে এভাবেই নিজেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে চন্দ্রা হয়তো ভাবে ড্যানিয়েল ওকে কখনও ছেড়ে যাবে না! ড্যানিয়েল হয়তো বেনারসে ওর 'ultimate experience'-এর কথা ভাবে! তাতে জড়িয়ে যায় চন্দ্রাও, — এই ঘাটগুলোর মতো, দশাশ্বমেধ, মান সিং, ললিতা, মণিকর্ণিকা— বিশ্বনাথের মন্দিরের মতো, কচোরি গলির হাভেলির মতো, বিবিরানির শ্যামকোষের মতো, ষাঁড় সাধু, গলি আর হিন্দু ধর্মের মতো! হিন্দু ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করার মতোই হয়তো চন্দ্রাকে বোঝার চেষ্টা করে ড্যানিয়েল! হয়তো ভাবে কী মহৎ! কী সরল? আর কী উন্মাদক!

এদিক-ওদিক তাকাতে মান সিং ঘাটের একটা চাতালের ওপর একা এক বালককে আরতি করতে দেখে হোমী গঙ্গার দিকে মুখ করে। একা কেন ? সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সেখানে! খেটো ধুতি পরা, ডান হাতে একটা মাত্র প্রদীপ, বাঁ হাতে ঘণ্টা— ছেলেটার নিবিড় ঠোঁট নাড়া দেখে শুনতে হয় না। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়— তা মন্ত্র ! ছোট্ট মুঠোর সঞ্চালনায় যেভাবে বাতাসের গায়ে দাগ কেটে যায় আগুন হোমীর মনে হয় সেভাবেই ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে তার হৃদয় অদৃশ্য ছুরিতে! না তার এইজন্য কান্না পায় না যে সে একা! বিষম একা! — তার কান্না পায় কারণ প্রেম নয়, প্রজ্ঞা নয়, মোক্ষ নয়— সে চেয়েছে অনন্ত ভবিষ্যতের হাত থেকে নির্বাসন! ঘটনার হাত থেকে নির্বাসন! সে চেয়েছে বন্দিত্ব! চরম বন্দিত্ব! ফাইনাল অ্যান্ড পারমানেন্ট কনফাইনমেন্ট! তার এই একাকিত্ব নইলে বিসদৃশ, অসার্থক। যে-জলের ওপর দিয়ে এলে সময়ও হয়ে ওঠে ধৌত, পবিত্র সেই জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল হোমী। ওদিকটা অন্ধকার! জল দেখা যায় না আসলে!

দেখা যায় অদ্ভুতভাবে সাজিয়ে রাখা ছোট-বড় নৌকো। জল কম, স্রোত নেই, নদীবক্ষে চড়ে বেড়াচ্ছে যে-নৌকোগুলো তাদের আলোগুলোও চোখে পড়ে। কাছাকাছিই ভেসে বেড়াচ্ছে— ঘাট থেকে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কাঁধ ধরে নাড়া দিল চন্দ্রা তাকে, 'হোমী, ড্যানিয়েলের ফোনে বিবিরানি ফোন করেছিল। জাহ্নবী বাইয়ের আজ শরীর খুব খারাপ। ওদিকে পার্বতীয়ার মেয়ের কোথাকার পচা প্রসাদ খেয়ে এমন ডায়রিয়া হয়েছে যে, হাসপাতালে দিতে হবে। আমি আজ জাহ্নবী বাইয়ের কাছে থাকব! তুমি ড্যানিয়েলের সঙ্গে হাভেলি চলে যাও, ও তোমাকে পৌঁছে দেবে। আমি জাহ্নবী বাইয়ের কাছে গেলে তবে পার্বতীয়া বাড়ি যাবে। তাই আমি এগোলাম!'

সে উঠে পড়েছিল। বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে জাহ্নবী বাইয়ের কাছে যাব! তোমার সঙ্গেই থাকব চন্দ্রা!'

চন্দ্রা থমকাল, 'না, বিবিরানি রাগ করবে!'

'কেন রাগ করবে?' বলতে বলতে সে দেখল চন্দ্রার চোখের কোলে জল চিকচিক করছে, 'কী হয়েছে চন্দ্রা? কাঁদছ কেন?' সত্যই তো! চন্দ্রার রূপ ঢেকে গেছে কোন অজানা বিষাদ আবরণে!

'পরে বলব হোমী!'

'না এখুনি বলো।'

ওদিকে আরতি শেষ হয়ে গেছে কখন তার খেয়াল নেই। ড্যানিয়েল কোথায় দেখতে গিয়ে সেটাই আগে চোখে পড়ল।

'শোনো হোমী, ড্যানিয়েল চলে যাচ্ছে! আর মাত্র ক'দিন। এখান থেকে ও হরিদ্বার যাবে, তারপর পুরী। ব্যস, ওর হাতে আর মাত্র পনেরোটা দিন ধরা আছে বেনারসের জন্য। আমি জানতাম না! ওর ভিসা শেষ! ঠিক তখনই শেষ যখন আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি।'

হোমী বলল, 'তুমি ভুল করেছ চন্দ্রা। তোমার বোঝা উচিত ছিল। ওকে তো ফিরতে হতই।'

'বোঝা যায়? আমি কিছু চাই না হোমী, শুধু যদি আর ক'টা দিন থাকত! আর একটা মাস?'

এই সময় তাদের পাশ থেকেই চন্দ্রার দিকে নিজের ফোনটা এগিয়ে দিল ড্যানিয়েল, 'বিবিরানি ইজ কলিং এগেন!'

নিজেকে সামলে নিল চন্দ্রা, 'তুমি ফিরে যাও হোমী, আমি জাহ্নবী বাইয়ের কাছে যাচ্ছি!'

সে বলল, 'বললাম তো, আমি তোমার সঙ্গে যাব চন্দ্রা। আমি বিবিরানির সঙ্গে কথা বলছি!'

ফোনটা ধরল সে, বিবিরানিকে বলল যে, সে চন্দ্রার সঙ্গে ওই হাভেলিতে যেতে চায়। জাহ্নবী বাইকে দেখতে চায়। বিবিরানি মত দিয়ে দিলেন।

অশ্লেষা তিথি ও একটি দুরূহ কাজ—

ড্যানিয়েল কখনওই তার বা চন্দ্রার থেকে বয়সে অধিক কিছু বড় নয়। হয়তো চন্দ্রার চোখে জল দেখে ওর মুখটা শুকিয়ে গেছে! ড্যানিয়েল বেনারসে এসেছে সাত-আট মাস হয়ে গেছে। আগেও একবার এসেছিল! হোমী ভাবল তা হলে চন্দ্রাকে সে বলতে পারে, 'হয়তো কিছুদিন পরে আরার ফিরে আসবে ড্যানিয়েল! কে বলতে পারে! আসা-যাওয়া চলবেই হয়তো!'

চন্দ্রা আর ড্যানিয়েল পাশাপাশি হাঁটছে, সে দু'কদম দূরে। ঘাট দিয়ে ঘাট দিয়ে যেতে যেতে তারা উঠে পড়ল রাস্তায়। পৌঁছে গেল গলিতে। একসময় বিরাট দরজার সামনে পৌঁছে কড়া নাড়ল চন্দ্রা। বিরাট কাঠের দরজা। ইয়া বড় লোহার হুড়কো, লোহার কড়া বসানো। কাঠের কারুকার্যগুলো ক্ষয়ে গেছে এত পুরনো দরজাটায়! দরজাটার গায়ে এত লোহার পাত বসানো যে, দেখতে কেমন জেলের দরজা মনে হয়! এ কথা ঠিক, মৃত্যু এখানে এই হাভেলির ভেতর একজনকে খাঁচাবন্দি করে রেখেছে!

তাদের পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছিল ড্যানিয়েল। চন্দ্রা পিছু ডাকল, 'তুম দো ঘন্টে বাদ ঘুমকে আওগে?'

'এত রাতে আসব?'

'কী এমন রাত হবে?' বলল চন্দ্রা, 'দশটা-সাড়ে দশটা বাজবে। পিছনের দরজা দিয়ে আমরা মণিকর্ণিকায় গিয়ে বসব।'

'যাওয়া সম্ভব?'

'কেন নয়, রাস্তা আছে!'

'আই ওয়ান্ট টু সি ইফ ইটস্ ট্রু!' ড্যানিয়েল চন্দ্রার কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিল। চন্দ্রা একবার মাত্র চেপে ধরল সেই হাত। তারপর ও চলে গেল, তারা ঢুকে পড়ল জাহ্নবী বাইয়ের হাভেলিতে!

এই হাভেলি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। জাহ্নবী বাইয়ের মৃত্যুর পর এ হাভেলি চলে যাবে কোনও এক মিশন সংস্থার হাতে। দান করা হয়ে গেছে! তখন এখানে ছাত্ররা থাকবে। আবাসিক বেদান্ত স্কুল হবে এটা তখন। ন্যাড়া মাথায় টিকি, খেটো ধুতি পরা ব্রাহ্মণ বালকরা বেদ পড়বে এখানে। বিশুদ্ধ দেবনাগরীতে!

এই মুহূর্তে চন্দ্রা দুঃখিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর গোটা শরীর থেকে একটা তেজ ফুটে বেরোচ্ছে! সেই তেজকে হোমী যৌন আকাঙ্ক্ষা কখনও বলবে না। চন্দ্রা ড্যানিয়েলকে কাছে পেতে চায়! হয়তো আগে যে সংকোচটুকু ছিল আজ তা কেটে গেছে ওর। ড্যানিয়েল আর ওর মধ্যেকার দূরত্ব যতই স্থায়ী ও অনড় হোক তা এই সময়ে কিছু ঘণ্টা কিছু দিনের জন্য তো ঘুচে যেতে পারে? চন্দ্রা ঠিক নিজের মধ্যে নেই, পার্বতীয়া কী বলল তা ও শুনলই না মন দিয়ে! পার্বতীয়া চলে গেল।

তারা দু'জনেই প্রবেশ করল জাহ্নবী বাইয়ের কামরায়। পরদা থেকে শুরু করে সব সাদা সেই ঘরের। হয়তো রং সহ্য হয় না মহিলার। খুব অল্প আলো, তাতেও যা দেখল হোমী গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই নারীই জাহ্নবী বাই? বিবিরানির মিউজিক রুমে এরই ছবি দেখেছে সে? ওই রূপবতীর এই চেহারা হয়েছে?

শীর্ণ শরীর মিশে রয়েছে বিছানায়। মুখটা তুবড়ে গেছে যেন টিনের ক্যানের মতো। কপালটা ঝুলে আছে চোখের উপর। কবিরাজ গঙ্গাধর রাউতের নিজের হাতে তৈরি ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন জাহ্নবী বাই। যদিও ইদানীং তিনি আর ওষুধ খেতে চান না। এবং খাওয়ানোয় বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই!

কিছুক্ষণের জন্য নিজের দুঃখ ভুলে গেল চন্দ্রা। ও জাহ্নবী বাইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরল বাইকে, 'মা, মা গো। খুব কষ্ট মা? খুব যন্ত্রণা?' জাহ্নবী বাইয়ের কোনও সাড় নেই। শুধু তাকিয়ে দেখছেন, চন্দ্রাকে, তাকেও!

'এবার থেকে আমি সবসময় তোমার কাছে থাকব মা! তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না! নিজের হাতে সেবা করব তোমার! ও হোমী, ও তোমাকে দেখতে এসেছে। কলকাতায় থাকে। পত্রকার, টিভি জার্নালিস্ট, দু'দিন বাদেই চলে যাবে। এখন আমাদের অতিথি!' অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে চন্দ্রা। জাহ্নবী বাইও ঘুমিয়ে পড়লেন বোধহয়। বুকটা এমনভাবে উঠতে-নামতে লাগল যেন প্রতিটাই অন্তিম নিশ্বাস!

হোমী এই ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল, খোলা এক টুকরো ঝুলন্ত অলিন্দ! হাঁটু অবধি উঁচু সরু সরু পাথরের রেলিং বসানো। তাতে পদ্মকাটা কাজ। ওই অদূরে একটা ঘাট! ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, ওই কি মণিকর্ণিকা ? সব দিক থেকে জাহ্নবী বাই মণিকর্ণিকার খুব 'করিব'।

চন্দ্রা ডাকল তাকে, 'হোমী, কী করছ?'

সে ঘুরে তাকিয়ে দেখল নিজের অবিন্যস্ত বেশবাস ঠিক করে নিচ্ছে চন্দ্রা, 'ড্যানিয়েল এসেছে, আমি কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েছি। তুমি কিছু খাবে? সুধা নিশ্চয়ই কিছু বানিয়ে রেখে গেছে। রোটি, সবজি, ডাল—খেয়ে নাও। নইলে বিবিরানি তোমাকে অভুক্ত রাখার জন্য আমার ওপর রাগ করবেন!'

'না, চন্দ্রা, আমি কিছু খাব না! অনেক ঘিয়ের খাবার খেয়েছি, বিকেলে অতটা সিরা খেলাম! আমি শুধু জল খাব, তারপর ওই বারান্দাটায় বসে থাকব।'

চন্দ্রা ইতস্তত করল, 'আমি ড্যানিয়েলের সঙ্গে একটু বেরোব হোমী, তুমি বিবিরানিকে বলবে না তো?'

সে মাথা নাড়ল, 'আমি তো কালই চলে যাব চন্দ্রা!'

'কালই?'

'হয়তো!'

চন্দ্রা বুঝে গেছে যে যার মতো সময় হলেই চলে যাবে। ও বেরিয়ে গেল! সে বারান্দা থেকে দেখার চেষ্টা করল ওদের। ঠিক বুঝতে পারল না। এদিকটায় কোনও আলো নেই তবু মনে হল চন্দ্রার চুড়ির শব্দের মতো একটা শব্দ মিলিয়ে গেল বাঁ দিকে। এইবার পরস্পরের সান্নিধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকার পর হয়তো ওদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। ওরা তখন ফিরে আসবে হাভেলিতে। আজ রাতে কোনও বাধা নেই।

বসে বসে দূর থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার শব্দ শুনছিল হোমী! নদীবক্ষে এখন আর কোনও খেয়া নেই। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে গ্লাস বা ওই জাতীয় কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল হোমী। গিয়ে দাঁড়াতেই একটা ক্ষীণ কিন্তু কর্কশ স্বর বলে উঠল, 'তুম কর সকতি হো! হাঁ, তুম!' জাহ্নবী বাই? সে আলো জ্বালল খুঁজে খুঁজে। আহ, কী যন্ত্রণাকাতর মুখ, কী জ্বলতে জ্বলতে বেঁচে থাকা।

'আপনার কিছু চাই?' বলল সে।

'মৃত্যু!' উনি ছটফট করে উঠলেন।

সে একটু সময় নিল কথা বলতে, 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে!'

'না! আর না!' করুণ প্রার্থনা ভেসে এল যেন একটা শূন্য আধার থেকে, 'তুমি আমায় মুক্তি দাও! তুমি দাও! তুমি তাই জন্যই এসেছ। আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'এ কী বলছেন আপনি?'

'যখন আমি উঠে দাঁড়াতে পারতাম তখনও, তখনও আমার জীবনের ওপর মায়া ছিল। নইলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারিনি কেন? আজ আমি অসহায়, আমি নিজেকে কী উপায়ে হত্যা করব বলো?' কাতরতম কণ্ঠে বললেন জাহ্নবী বাই। স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল হোমী জাহ্নবী বাইয়ের যুক্তি।

'তুমি আমাদের কেউ না। আমাকে কখনও দেখোনি আগে। আমার প্রাণের প্রতি তোমার কীসের মায়া?'

'তোমার জন্য এত করা হল! প্রতিদান দাও!'

'দয়া করো! দয়া করো!'

'আরও মর্মান্তিক মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। আমার গায়ে ঘা হচ্ছে!'

এইখানে হোমীর মনে হল তার বাবাও এখনও বেঁচে আছে কেন? বাবারও তো মৃত্যু হওয়া উচিত। বাবারও তো গায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে!

'এসো! এগিয়ে এসো।' জাহ্নবী বাইয়ের চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃত্যুর দুর্মর কামনা সমস্ত গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই চোখে। মারাত্মক, সম্মোহক দুটো চোখ— হোমীকে টানছে! টানছে! তার মনে হল সে এগিয়ে যাচ্ছে মহিলার দিকে। এগোচ্ছে, এগোচ্ছে, সে ঝুঁকে পড়েছে বাইয়ের ওপর।

'গলা দাবা দো বেটা।'

তার হাতের রেখায় প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই, মায়া নেই— তা হলে এখন সে নিজের হাতের রেখাকে ভুল না ঠিক, কী প্রমাণ করতে চলেছে? সে কি করুণা করছে এই মহিলাকে? ললিত বলত সে আত্মপ্রেমে মগ্ন। স্বার্থপর। সে কি এখনও তাই? সে জাহ্নবী বাইয়ের গলা টিপে ধরল দু'হাতে। টিপে ধরে ঝাঁকাল একবার। একটা শব্দ বেরোল বাইয়ের মুখ থেকে। মুখটা হাঁ হয়ে চোয়াল খসে পড়ল। আর একবার ঝাঁকিয়ে হাত আলগা করে দিল হোমী! শরীরটা গড়িয়ে গেল। এক পাশে কাত হয়ে গেল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কখন।

এখন কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঘণ্টাধ্বনিও থেমে গেছে!

একটি কাল্পনিক মিলন

সে ঠিক পালাতে চায়নি। আবার অপেক্ষাও করতে চায়নি কোনও কিছুর জন্য। যেমন ধরা যাক— চন্দ্রা আর ড্যানিয়েলের ফিরে আসার জন্য! সে বোঝেনি ঠিক কী ঘটল এক্ষুনি, আবার একেবারে বোঝেনি যে তা-ও নয়। সে জানে না এত রাতে সে কোথায় যাবে? আবার তার কাছে দুশোটা টাকা আছে এটাও মনে আছে তার!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল হোমী দোতলা থেকে। নিঃশব্দে খোলার চেষ্টা করল জাহ্নবী বাইয়ের হাভেলির দরজা। দরজা খুলতে অসুবিধা হল না কোনও। হোমী পা রাখল গলিতে। হাঁটতে লাগল। হাঁটতেই লাগল। কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছিল তাকে দেখে কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ না করেই এগোল দ্রুতপদে। কোথাও আলো আছে, কোথাও আলো নেই। গলি কখনও সরু কখনও একটু চওড়া। প্রতি মুহূর্তে সে ভাবতে চেষ্টা করল আর কয়েক পা গেলেই বড় রাস্তায় পড়বে। চক-এ গিয়ে পড়বে। একবার সে ভাবল বিবিরানিকে মৃত্যুসংবাদটা দিয়ে খুলে বললেই হবে জাহ্নবী বাই কী অনুরোধ করেছিল তাকে। বিবিরানি নিশ্চয়ই বুঝবেন!

সে নানা কথা ভাবল আর হাঁটতে লাগল। এক গলি থেকে আর এক গলি, ধূসর, হতশ্রী, পোড়ো গলি সব। নরকের নোংরা। ক্রমশ সে বুঝল গলি থেকে গলি ব্যর্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু, বের হতে পারছে না। কিংবা বিবিরানির হাভেলিও খুঁজে পাচ্ছে না। বস্তুত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে একই দুর্বোধ্য গলিপথে। ফিরে ফিরে আসছে একই জায়গায় বারংবার। পাগলের মতো সে ছুটল। দৌড়োল। গলি থেকে গলিকে আলাদা করার চিহ্ন অনুসন্ধান করে মনে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না। মনে হল এ একটা অন্ধকূপ, তার দমবন্ধ হয়ে যাবে এখানে! হাঁপাতে হাঁপাতে, ঘামতে ঘামতে হোমী দেখল সে জাহ্নবী বাইয়ের হাভেলির সামনেই দাঁড়িয়েছে এসে শেষ পর্যন্ত।

'মহারানি!'

তখনই এই ডাক অন্তঃস্থল স্পর্শ করে গেল তার। সে ঘুরে গেল ধীরেসুস্থে। কোনও তাড়া করল না। সেই পরিচিত মুখ, সেই সমীহ আদায়কারী জটাজাল, সেই চোখ— প্রেমে, কামে, মোহে দগ্ধ হতে থাকা, আবিষ্ট। নীল কম্বল ঝুলে আছে কাঁধ থেকে। ঠান্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে বাতাস! তীব্র কটু গন্ধ!

'মহারানি!'

না, এভাবে তাকে কেউ কখনও ডাকেনি!

'এসো!'

হোমী অন্য কোনও দিকে দৃকপাত করল না। সে পুনরায় প্রবেশ করল হাভেলির ভেতর। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। সেই সাধু অনুগমন করল তাকে। তার নিয়তি। যাকে সে আর বঞ্চিত করবে না মিলন থেকে! অনেক হয়েছে! একসময় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল তারা। সঙ্গে সঙ্গে হোমী টের পেল কী কঠিন, কী নির্মম, কী দানবীয় লোকটার দণ্ড! সে কৌপিন সরিয়ে ফেলল এক ঝটকায়। দেখল সেটা লাফাচ্ছে! লাফাচ্ছে!

অযত্নবর্ধিত, অনাদৃত! তবু এই নিয়তি তার। তাকে ছেড়ে যায়নি! যাবেও না! ভালবাসতে চাইবে! মিলন চাইবে!

তৎক্ষণাৎ মিলনোন্মুখ হল সেও, যোনিদ্বার বিমুক্ত করল, এবং লোকটা উঠে এল তার শরীরে। ঠোঁট ঘষতে লাগল স্তনে। বাহুতে। গ্রীবায়। তার কাল্পনিক জীবনের কাল্পনিক শরীরকে নিষ্পেষিত করতে লাগল নির্লজ্জ প্রেমিকের মতো। হোমীও নিজের কাল্পনিক শরীরের কাল্পনিক করতলে ধরে নিল লোকটার সেই অতিকায় মস্তক— ভারী, বিপুল, জটাময়!

সে মাথাটাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরল বুকে!